…জ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

…দশ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা □ মে-জুন 1988 □ দু'টাকা

…ান-স্ট রিভলিউশন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মাসানোবু ফুকুয়োকা

'ওয়ান-স্ট্র রিভলিউশন'

গ্রীন পার্টি পরিচিতি

সবুজ সম্ভাবনা (তিন)

পারমাণবিক শক্তি

পরিচালন ব্যবস্থা

ক্রোড়পত্র

প্রাথমিক বিজ্ঞানশিক্ষা

প্রশ্ন ও উত্তর

জ্যোতিষ সম্মেলনে

গণবিজ্ঞান পরিচিতি

বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়

যুক্তিবাদী অনুসন্ধান

বালি-বাণ

প্রশ্ন ও মন্তব্য

চিঠিপত্র

…জ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মে-জুন 1988 একাদশ বর্ষ ☐ ষষ্ঠ সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 মাসানোবু ফুকুয়োকা
☐ মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

5 সবুজ সম্ভাবনা
☐ সুমিত বিশ্বাস, সুজয় মুখার্জী, সুরঞ্জন কর

8 পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প : পরিচালন ব্যবস্থা—বিভিন্ন পর্যায়ে
☐ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

9-16 ক্রোড়পত্র
বিজ্ঞানশিক্ষা : প্রাথমিক হালচাল
☐ রবীন মজুমদার

17 জ্যোতিষ সম্মেলনে 'বিজ্ঞান চেতনা'
☐ বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়

19 ।। গণবিজ্ঞান ।।
বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়
☐ শান্তনু ত্রিবেদী

21 বালি-বাণ
☐ অঞ্জন চতুর্বেদী

22-24 চিঠিপত্র
☐ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
☐ সুব্রত ভট্টাচার্য
☐ সৌমেন গুহ

তৃতীয় প্রচ্ছদ 'জলের খোঁজে'
☐ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং
বি-ও-বি'র ভুল সংশোধন

প্রচ্ছদ : সৌজন্য 'One Straw Revolution'

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। তবে সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনেরো টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। নিচে ঠিকানা দেওয়া হল।

বিদেশের গ্রাহক এবং প্রতিষ্ঠানিক গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বিদেশের গ্রাহকদের বাৎসরিক চাঁদা দশ ডলার। বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য ভারতীয় টাকায় বারো টাকা। প্রতিষ্ঠানিক চাঁদা চল্লিশ টাকা। এজেন্ট কমিশন : দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ।

যোগাযোগের ঠিকানা

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'
c/o অভিজিৎ লাহিড়ী, EC 106, সল্ট লেক, কলকাতা 700 064।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী যেখানে পাবেন

বা সরী বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (ঘোষ কেবিনের পাশে)
☐ পাল বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (হরিদাস মোদকের মিষ্টির দোকানের পাশে)
☐ দত্ত বুক স্টল—বাগবাজার (দ্বারিক ঘোষের পাশে)
☐ পাতিরাম—কলেজ স্ট্রীট
☐ মহীন্দর বুক স্টল ; কে সিং ; নন্দীকিশোর (নানকা) ; শম্ভু মণ্ডল ; মহেন্দ্র মণ্ডল—কলেজ স্ট্রীট (পাতিরামের সামনে ফুটপাতের স্টলগুলোতে)
☐ মা কালী বুক স্টল—শ্রীমানি মার্কেটের বিপরীতে বিধান সরণীতে
☐ ঘোষ বুক স্টল—বিধান সরণী (বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে)
☐ রাণা'র দোকান—কলেজ স্কোয়ারের উল্টো দিকে
☐ দমদম স্টেশন ; শিয়ালদহ স্টেশনের স্বপন, পঙ্কজ ও চঞ্চলের বুক স্টল
☐ রায়গঞ্জ সায়েন্স ক্লাব

মাসানোবু ফুকুয়োকা

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

মাসানোবু ফুকুয়োকা এক নতুন বিপ্লবের প্রবক্তা—যে বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হল কৃষি জমিতে পড়ে থাকা খড়কুটো, আগাছা। তবে, ফুকুয়োকার 'ওয়ান-স্ট্র রেভলিউশন'-এর তাৎপর্য বুঝতে হলে আধুনিক যান্ত্রিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উন্নয়ন, ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্মূল্যায়ন দরকার।

ভূমিকা

মানুষের সমৃদ্ধি তথা অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষি-কর্ম বা চাষবাস। অথচ বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় এই বিষয়টি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ—বিশেষত খাদ্য-আহরণকারী ও কৃষিজীবী মানুষরা চাষবাস উদ্ভাবন করেছে, মানব সভ্যতাকে ধরে রেখেছে ও উন্নত করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ইউরোপীয় শিল্প ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক বিপ্লবের সূতিকাগৃহ থেকে জাত আধুনিক বিজ্ঞান এই শতাব্দীতে (বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে) যখন কৃষিকর্মের দিকে নজর দিল তখন থেকেই কৃষি ও মানব পরিবেশ বেশী বেশী সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠলো। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট, জমির উর্বরতা নাশ, পরিবেশ দূষণ, পেস্ট সমস্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ বা পরিণতি। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার ধারক ও বাহক হল ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি। বিজ্ঞানের এই দুই শাখা থেকে যে সব প্রযুক্তি এসেছে তারা মানব সমাজ ও জীবজগতের উপর তাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অন্ধ বা উদাসীন। অথচ অসম্পূর্ণ এই পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞানকেই বিশ্বজনীন, ও পৃথিবীর সকল মানুষের বিকাশ ও মুক্তির এক এবং অদ্বিতীয় পন্থা ও হাতিয়ার হিসাবে চাপানো হচ্ছে। অবিরাম প্রচারে আমরা এটাই বিশ্বাস ও গ্রহণ করে এসেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের একাংশের ভিতরকার জীবনবিরোধী, ধনতান্ত্রিক ও বর্ণবিদ্বেষী চরিত্র আমাদের চোখেই পড়েনি।

অনুসন্ধান করলে উৎপাদন ও কাজ করবার যে সুন্দরতর ও মানবিক বিকল্প বার হতে পারে তার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত মাসানোবু ফুকুয়োকার স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্ম, ন্যাচারাল ফার্মিং। চাষের এই অভিনব পদ্ধতিতে সনাতন পদ্ধতি নেই আবার আধুনিক মার্কিনী রাসায়নিক কৃষি-কর্মও পরিত্যক্ত। ফুকুয়োকার ন্যাচারাল ফার্মিং-এ ভূমি কর্ষণের ব্যাপারটাই নেই। তাই এই আলোচনায় কৃষিকর্ম কথাটা ব্যবহার না করে ক্ষেতিকর্ম শব্দটা ব্যবহার করাই সঙ্গত মনে হল। ফুকুয়োকার কৃষিকর্মে জমি চাষ নেই, রাসায়নিক সার (এমনকি জৈবসার বা কম্পোস্টও) নেই, পেস্টি-সাইডের প্রয়োগ নেই, নতুন জাতের "উচ্চফলনশীল" (!) বীজ নেই, বড় বড় কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার নেই। আধুনিক রাসায়নিক কৃষিকর্মের বিপরীতে উৎপাদনহার অব্যাহত রেখে ভিন্নতর পদ্ধতিতেও যে কৃষিকর্ম সম্ভব, বরং মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতি না করে, সামাজিক বৈষম্য না বাড়িয়ে, আরো সুন্দরভাবেও যে তা সম্ভব, তা ফুকুয়োকার কাজকর্মে স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে। ফুকুয়োকার জীবন ও বিশ্বদর্শন সম্বন্ধে আমরা অনেকে একমত নাও হতে পারি, এমনকি যে সব ধারণাবলী থেকে তিনি নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছিলেন, সেগুলোর নির্ভুলতা বা বাস্তবতাও প্রশ্নাতীত না হতে পারে। কিন্তু হাতে কলমে কাজ করে তিনি যে সব আবিষ্কার করেছেন, সেগুলো মানব-সমাজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানভাণ্ডারে যে একটা মূল্যবান স্থায়ী সংযোজন, তাতে সামান্যই সন্দেহ আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজকর্ম থেকে যে সঠিক আইডিয়া আসে, তা আবারও দেখা গেল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানসীমার বাইরেও যে অনাবিষ্কৃত বৃহৎ রাজ্য থাকতে পারে তাও দেখা গেল। ফুকুয়োকা ও তাঁর ক্ষেতি পদ্ধতি আজ বিশ্বের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। 1975 সালে জাপানী ভাষায় তাঁর "The One-straw Revolution : An Introduction to Natural Farming" বেরোয়। 1976 সালে তার ইংরাজী অনুবাদ হয়। ভারতে পুনর্মুদ্রণ 1984-তে (Friends' Rural Centre, Rasulia, Hosangabad, M.P. 461 001)। কলকাতায় 30 টাকায় কিনতে পাওয়া যায় "ক্ল্যাসিক বুক্স" (10 Middleton Street, Calcutta 700 001)-এ। বর্তমান প্রবন্ধকার / ভাষ্যকারের কৃষি বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ফুকুয়োকার বইটি পড়ে, তাঁর বক্তৃতা, ভিডিও ও স্লাইড দেখে মুগ্ধ হয়ে কিছু কৃষিবিজ্ঞানীর সাথে আলোচনা করে বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করেছি।

ফুকুয়োকা মানুষটি

"আমি একজন মামুলি জাপানী কিষাণ" বলে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফুকুয়োকা তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছিলেন জাপানী ভাষায় এবং একজন অনুবাদক জাপানী থেকে হিন্দীতে ফুকুয়োকার বক্তৃতা তর্জমা করছিলেন। 75/76 বৎসর বয়স্ক সাদামাটা আলখাল্লা পরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের দার্শনিক কৃষক মানুষটির হাতে হাত দিলেই বোঝা যায় দীর্ঘ ক্ষেতিকর্মে হাত কত শক্ত ও কর্কশ। বৌদ্ধধর্ম ও প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাঁর সমস্ত কাজকর্ম ও জীবনদর্শনের ভিত্তি রচনা করেছে। প্রকৃতিকে জয় করবার ও তাকে খণ্ডচ্ছিন্ন করে বোঝবার আধুনিক বিজ্ঞানের মূল প্রবণতার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে ফুকুয়োকা প্রকৃতিকে দেখেছেন অজ্ঞেয় ও রহস্যময়রূপে এবং প্রকৃতির গতিধারাকে

বোঝবার ও ক্ষেতিকর্মে তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। ফুকুয়োকা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি, অথবা বলা যায় বিজ্ঞানের নামে যা চলছে তার প্রতি, সন্দিগ্ধ। ফুকুয়োকা বলেন : মানুষের জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ, বিজ্ঞানই এটা তাঁকে শিখিয়েছে।

শিকোকু অঞ্চলে মাৎস্যুয়ামা নগরীর কাছে পাহাড় ও উপত্যকায় ফুকুয়োকা পরিবার বহু শতাব্দী ধরে বাস করে এসেছেন। বাবা ছিলেন গ্রামের মোড়ল, তিনি কৃষিকর্ম করতেন। মাসানোবু ফুকুয়োকা মাইক্রো-বায়োলজিস্ট হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং 1930-এর দশকে জাপান সরকারের অধীনে ইয়োকাহামা কাস্টমস্ দপ্তরে শস্যরোগ বিশেষজ্ঞরূপে

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসানোবু ফুকুয়োকা

জানুয়ারী মাসে নদীয়া জেলার মোহনপুরে যেদিন ফুকুয়োকা বক্তৃতা করতে এলেন, সেদিন ঐ সভাতে ফুকুয়োকাকে বসিয়ে রেখে জনৈক প্রবীণ অধ্যাপককে দিয়ে স্লাইড সহযোগে দীর্ঘ সময় ধরে যে বক্তৃতা দেওয়ানো হল, তা কেন এবং কার স্বার্থে, তা নিয়ে দর্শক মহলে গুঞ্জন উঠেছিল। সেই সভায় কোন কৃষককে ডাকা হয় নি। কোটপ্যান্ট টাই পরা "কৃষি বাবুরা" ইংরাজীতেই সব কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন আর ফুকুয়োকা জাপানীতে। ইংরাজী বা অন্য ভাষা না জানার জন্য ফুকুয়োকা মোটেই সঙ্কুচিত ছিলেন না। ফুকুয়োকাকে ভারতে এনে পরিচয় করানোতে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ফুকুয়োকা ও কৃষিকর্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচিতি করার বক্তৃতা চমৎকার ইংরাজীতে শুরু করে তিনি বললেন : "যেহেতু স্বাভাবিক কৃষিকর্ম আমাদের আলোচ্য, তাই স্বাভাবিক মাতৃভাষাতেই আমার বক্তব্য রাখতে চাই" বলে ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত অশীতিপর বৃদ্ধ সুন্দরভাবে তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন। ফুকুয়োকা তাঁর বক্তব্যে এক জায়গায় বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে এখানে (মানে ভারতে) এত সুন্দর জমি, অথচ কত কম কাজে লাগানো হয়, এবং বছরের কিছু সময় একেবারেই খালি থাকে।

চাকরী আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি শস্য ও শস্যরোগাদি নিয়ে পড়াশুনা কাজকর্ম করেন। তিনি জীবন মৃত্যু প্রকৃতি ধর্ম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বরাবরই ভাবনাচিন্তা করতেন। যখন তাঁর 25 বৎসর মত বয়স (1938 সাল) তখন ল্যাবরেটারিতে অত্যধিক শ্রমের কারণে একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সহকর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এই সময়ে জীবন-মৃত্যু-সমাজ-সংসার-বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এমন সব উপলব্ধি হয় যার ফলে সাধারণ মানুষের মত সংসার করা, চাকরী করা এইসব বিষয়ে তাঁর মোহমুক্তি হয় এবং চাকরীতে ইস্তফা দেন।

গ্রামে ফিরে এলেন। বাবা তাঁর ফলের বাগান দিলেন ছেলেকে দেখতে। ফুকুয়োকা ফলের বাগান ও গাছগুলিকে আপনমতে প্রকৃতির নিজস্ব স্বাস্থ্যপ্রদ নিয়মে চলতে দিলেন। তাঁর উপলব্ধি ছিল, শস্য ফল ইত্যাদি উৎপন্ন করতে হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মেই সেসব হয়। প্রকৃতির উপর তাঁর এই অগাধ 'বিশ্বাসের' মূল্য অচিরেই গুনতে হল। দু-একরের চমৎকার কমলার বাগান নষ্ট হয়ে গেল, বিশেষ করে কীটের আক্রমণে। বাবা ও গাঁয়ের লোকেরা বিরক্ত হল। আবার চাকরী নিতে হল। যুদ্ধে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি এক গভীর সত্য উপলব্ধি করলেন : বাবার ফলের বাগানে তাঁর কীর্তিকে মূর্খামি বলা যায়, প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্ম ওটা নয়। 'কচি প্রিফেকচারে' শস্যকীট ও শস্য অসুখের প্রধান গবেষক হিসাবে আট বৎসর কাজ করলেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর কাজে এই সময় তিনি কৃষিবিজ্ঞানে প্রচুর পড়াশুনা করেন আর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যুদ্ধ শেষ হলে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্মের সযত্নে লালিত ধারণাবলী মাথায় নিয়ে আবার তিনি গ্রামে ফিরে এলেন। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি তাঁর ক্ষেতে ধান, তরিতরকারি ও ফলের চাষ করে তাঁর প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্মের "বিজ্ঞানকে" (?) শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন।

প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্ম

গ্রাম্য পথে যেতে যেতে বহুদিন অনাবাদী তৃণাকীর্ণ এক জমিতে ঘাস ও অন্যান্য আগাছার মধ্যে সতেজ ও বলিষ্ঠ কিছু ধানগাছের আত্মপ্রকাশ দেখে ফুকুয়োকার মাথায় প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্মের মূল আইডিয়াটা আসে। সবুজের সমারোহ ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর অরণ্যভূমিতে যখন চাষবাস করতে হয় না, আগাছা বা পেস্ট দমন করতে হয় না, রাসায়নিক সার দিতে হয় না, তাহলে মানুষও সেইভাবে তার ক্ষেতিকর্মকে চালাতে পারবে না কেন, এই ধারণাও তাঁকে উদ্দীপিত করে। ফুকুয়োকা-উদ্ভূত প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্ম ভালো করে বুঝতে হলে তাঁর রচনাবলী ভালো করে পড়া দরকার। প্রথমেই বলে রাখি ফুকুয়োকা যে সব কলাকৌশলে তাঁর ক্ষেতিকর্ম করেন, সেগুলো অবিকল অন্যত্র প্রযোজ্য না হবার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ জলবায়ু, মাটির প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও কীটপতঙ্গাদি পৃথিবীর সর্বত্র এক নয়। তবে মূল নীতিগুলি সর্বজনীন ও সহজবোধ্য।

জমি চাষ চলবে না—চাষ করলে জমির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। মাটি জমাট বাঁধে, মাটির ইকোসিস্টেম নষ্ট হয়। নিচের আগাছার বীজ উপরে উঠে এসে অঙ্কুরিত হয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে জমি রেখে দিলে নানারকম উদ্ভিদ ও ঘাস জমির জল ও বাতাসের প্রবেশ্যতা বজায় রাখে, কেঁচো, কীট-কীটাণু ও ছোটো ছোটো নানা প্রাণী আপনিই জমি চাষ করে। আদিম পদ্ধতিতে আগুন লাগিয়ে জমি চাষ করাও জমির স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ফুকুয়োকা দুঃখ করে বলেছেন যে বহু শতাব্দী ধরে জাপানী কৃষক লাঙ্গলকে ক্ষেতিকর্মের আবশ্যিক অঙ্গ মনে করে জমির অনেক ক্ষতি করেছে।

'কম্পোস্ট' বা রাসায়নিক সার চলবে না—না বুঝে জমি চাষ করে ফসল বুনলে জমির উর্বরতা কমে যায়। উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ

তাদের স্বাভাবিক জীবনচক্র মারফৎ জমির উর্বরতা স্বাভাবিকভাবেই বজায় রাখে। জমিতে নাইট্রোজেনের সরবরাহ ভালো রাখবার জন্য ফুকুয়োকা নাইট্রোজেন সংগ্রাহী (Nitrogen fixing) ক্লোভার, আলফা-আলফা ইত্যাদি জাতীয় উদ্ভিদের বীজ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ছড়িয়ে যান। সাময়িকভাবে জমিতে জল ধরে রেখে আগাছা মেরে পচিয়ে এবং আলগা-ভাবে ছড়ানো খড় ছ-মাসে পচিয়ে জমির পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার পদ্ধতি ফুকুয়োকার প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্মের আর এক বড় বিশেষত্ব।

যন্ত্র বা রাসায়নিক দিয়ে আগাছা দমন নিষিদ্ধ—জমির উর্বরতা ও তার জৈবিক সম্প্রদায়ের (বায়োলজিক্যাল কমিউনিটি) স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য তথাকথিত আগাছার মূল্যবান ও কার্যকরী ভূমিকা থাকে। ফুকুয়োকা জোর দিয়েছেন আগাছা নিয়ন্ত্রণের, বিনাশের ওপর নয়। খড়-পচা, সাময়িকভাবে জমিতে জল ধরে আগাছা দমন এবং ফসলের সাথে শ্বেত ক্লোভার বাড়তে দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ ফুকুয়োকার আর এক কৌশল। রাসায়নিক ব্যবহার চলবে না—ফুকুয়োকা বলেন প্রকৃতিকে নিজের মত চলতে দিলে সে সুষম (balanced) অবস্থায় থাকে, তার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি ভালো থাকে। ক্ষতিকর রোগজীবাণু, কীটপতঙ্গ সব সময়েই কিছু থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকলে সেগুলো কখনোই মারাত্মক হয় না। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তেজী শস্য উদ্ভিদ হতে দিলে কীট ও রোগ বীজাণুর ক্ষতি করার ক্ষমতা সীমিতই থাকে। ক্ষেতিকর্মে সব সমস্যার মূলেই দেখা যায় সনাতন পদ্ধতি বা বর্তমানের রাসায়নিক নির্ভর কৃষি প্রযুক্তি।

ফুকুয়োকার নির্দেশিত পথে ন্যাড়া পাহাড়ে, অনুর্বর কর্দমাক্ত লাল মাটিতে (ল্যাটেরাইট সয়েল) কয়েক বছরেই উর্বরতা ফিরিয়ে এনে সবুজের সমৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটানো গেছে। এক বিঘে মতন জমিতে (quarter acre) গোটাদশেক হাঁস-মুরগী আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ করে। রাসায়নিক দিয়ে বা পুরাতন চাষের পদ্ধতিতে জমির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট না করলে মাকড়সা, ব্যাঙ, প্রভৃতি ক্ষেতের পোকা-মাকড় চমৎকার নিয়ন্ত্রণে রাখে। জমিতে আলগাভাবে খড় ছড়িয়ে কাদা দিয়ে মোড়া ধান ও অন্যান্য শস্যবীজ নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী ছড়ালে বীজ পাখীতেও কম খায়, আগাছাও বাড়তে সুযোগ কম পায়, আর জমিতে সারও চমৎকার হয়। ফুকুয়োকার ক্ষেতিকর্মে খড়ের অসাধারণ গুরুত্ব। তিনি বিশ্বাস করেন খড়ই এক নব-বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারে। 1950-এর দশকে ও তার আগে জাপানে ফলবাগিচাতে ঘাস বা আগাছা হতে দেওয়া হত না। ফুকুয়োকার কাজের ফলে জাপানে আজ অবস্থা পরি-বর্তিত। ফলের বাগানে এখন শুধু ঘাসই নয়, নানা রকম লতা গুল্ম ও

প্রাকৃতিক ক্ষেতি : ভারতে

আধুনিক যুগের আগে (প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল প্রাকৃতিক ক্ষেতি যে চলতো তা ভাবার সঙ্গত ভিত্তি আছে। প্রাচীন ভারতের তথাকথিক তপোবনগুলি যে আদর্শ ন্যাচারাল ফার্ম তা অনেকেই বিশ্বাস করেন (দ্রষ্টব্য : পরতাপ আগড়ওয়াল : **The Healing Touch : The Illustrated Weekly of India : May 22-28, 1988**)। মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে নর্মদা নদীর ধারে "ফ্রেণ্ডস্ রুরাল সেণ্টারে" পরতাপ আগড়ওয়াল ও তাঁর গান্ধীবাদী সহকর্মীরা গো-পালন ও প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্মের যে সব কাজ করতেন ফুকুয়োকার কাজকর্ম জানার পর তাতে উৎসাহ ও বেগের সঞ্চার হয়। এখানকার 45 একর জমির মধ্যে 25 একরে নিয়মিত চাষ হয়। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এঁরা প্রথমে বন্ধ করেন; তারপর কর্ষণও এঁরা কমিয়েছেন। এঁরা দেখেছেন প্রাকৃতিক ক্ষেতিতে মেক্সিকো দেশীয় সঙ্কর জাতের গম ভালো হয় না। প্রকৃতপক্ষে সঙ্কর জাতের বেশীর ভাগ বীজই এই পদ্ধতিতে ভালো উৎপাদন দেয় না। তবে ধানে "রত্না" এবং বাসমতী এখানে ভালোই খাপ খেয়ে গেছে। গুজরাট থেকে পাওয়া দিশী এক গম এখানে ভালো ফলন দিচ্ছে। প্রথমে এঁরা তিন একর জমিতে, পরে ছয় একরে বিনা কর্ষণে ফসল উৎপাদন করেন। একর প্রতি এঁরা 20 কুইন্টাল ধান পেয়েছেন। এঁরা দেখেছেন "ক্লোভার" (বারসীম), সয়াবিন, ধান অনাবাদী জমিতে ভালোই হয় এবং ক্লোভার "আগাছাকে" ভালোই নিয়ন্ত্রণে রাখে। অভিজ্ঞতা থেকে এঁরা বুঝেছেন যে ভূমিক্ষয় হলে আগাছা আপনিই জন্মে আর ভূমিক্ষয় না হবার ব্যবস্থা থাকলে (যেমন স্থায়ী সবুজ আস্তরণের বিস্তারের মাধ্যমে) আগাছা কমে যায়। এই ধরনের ক্ষেতিকর্মকে তাঁরা "ঋষিক্ষেতি" নাম দিয়ে-ছেন এবং এই পথে ভারতীয় কৃষির তাঁরা বিকল্প অনুসন্ধান করছেন। তাঁরা মনে করেন প্রকৃতি, গ্রাম ও চাষীর উপর গভর্নমেণ্ট ও বড় শিল্প-পতিদের অশুভ শোষণ ও অবদমন এই পদ্ধতিতে আটকানো যাবে।

* * *

এঁদের এক প্রতিবেশী ও বন্ধু (কৃষ্ণকুমার) $3\frac{1}{2}$ একর জমিতে এঁদের থেকেও ভালো সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর 4 জনের পরিবারের সকলেই ছোট ক্ষেতটিতে কাজ করেন। বছরে এরা প্রায় 18 হাজার টাকা উপার্জন করতে পেরেছেন। রসুলিয়ার পাশের গ্রামে রাজু তিতাস নামে কৃষক তাঁর 13 একর জমিতে প্রাকৃতিক ক্ষেতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাঁর সাফল্য আসেনি তবে তাঁর জমির উর্বরতা ও মান গত দেড় বছরে ঢের বেড়েছে।

[সূত্র : **Report, 1986, Friends' Rural Centre, Rasulia, Hosangabad, M. P. 461 001**]

* * *

প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্মের কাজ পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু শুরু হয়েছে। উত্তর 24 পরগণার মছলন্দপুর স্টেশন থেকে প্রায় 10 কিমি দূরে আটঘরায় ("বিকাশ কেন্দ্র") শ্রীঅশোক ঘোষের উদ্যোগে গত তিন বছর ধরে বিনা কীটনাশকে বোরো ধানের চাষ হচ্ছে।

অন্যান্য উদ্ভিদ হতে দেওয়া হয়। তাতে ফলবাগিচার ভালোই হয়েছে। রঙীন স্লাইডে ও ভিডিও ফিল্মে ফুকুয়োকার ক্ষেতের ফসলের প্রাচুর্য ও বাগিচায় গাছে গাছে ফলের সমারোহ চোখ জুড়িয়ে দেয়। ফুকুয়োকার ক্ষেতে দেখা যায় মোটা মোটা বড় বড় ধান গাছ ভর্তি সোনার ধান। বিন, শসা, মূলো, টোম্যাটো, সর্ষে, রাই, বার্লি, গাজর, শালগম, বাঁধাকপি ইত্যাদিও প্রচুর হয়। অথচ তাঁর জমিও প্রচুর নয়—সওয়া একর ধানী জমি, আর সাড়ে বার একর কমলালেবুর বাগান, পাহাড়ের গায়ে। টোকিওর বাজারে ফুকুয়োকার ক্ষেতের ফসলের সাঙ্ঘাতিক চাহিদা অথচ সবচেয়ে কম দাম। দোকানদার খদ্দেরের কাছ থেকে বেশী দাম নিলে ফুকুয়োকা চটে যান।

ফুকুয়োকার মতামতের আরো কিছু

আগেই বলেছি ফুকুয়োকার জীবনদর্শন ও জীবনধারা সম্বন্ধে আমরা কেউ কেউ সম্পূর্ণ একমত নাও হতে পারি। তবে তাঁর আশ্রমিক জীবন এবং ক্ষেতিকর্মে গভীর শ্রদ্ধা তাঁকে যে অসামান্য শক্তি ও সাহস দিতে পেরেছে তাতে সামান্যই সন্দেহ আছে। মাৎসুয়ামা উপসাগরের পাড়ে পাহাড়ের গায়ে ফুকুয়োকার ছোট ক্ষেতে চার-পাঁচজন ছাত্র/শিক্ষানবীশ প্রায়ই কাজ করে। তাছাড়াও আরো কিছু নর-নারী দু-চার দিন বা দু-চার সপ্তাহ এখানে কাটিয়ে যায় ও কাজ করে, কাজ শেখে। ফুকুয়োকার খামারে জীবনধারণের আধুনিক সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত নেই। পাহাড়ী ঝরণা থেকে বালতি করে জল তুলে আনতে হয়। রান্নার জন্য কাঠ সংগ্রহ করে উনানে সাদামাটা রান্না হয়। কেরোসিনের কুপি আর মোমবাতিই আলোর ভরসা। পাহাড়ী উদ্ভিদ, নিকটবর্তী নদী সমুদ্র থেকে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। সকাল প্রায় আটটা থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ক্ষেতে কাজ হয়। মাঝে ঘণ্টা খানেকের (নিদারুণ গরমে দু-তিন ঘণ্টা) বিরতি, মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। ক্ষেতিকর্ম ছাড়াও ছাত্ররা জল তোলে, জ্বালানী সংগ্রহ করে, ছাগল ও হাঁস মুরগীর পরিচর্যা করে, মৌমাছিদের মৌচাকের যত্ন নেয় এবং কখনো কখনো বাস করবার নতুন কুটীর নির্মাণের কাজ করে। ফুকুয়োকা নিজে হাতে প্রচুর কাজ করেন, ওপর থেকে নিচে, ক্ষেতের এদিক থেকে ওদিকে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই ফুকুয়োকা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা চালিয়ে যান বা বহিরাগত অতিথি বা জিজ্ঞাসুদের প্রয়োজন মেটান। সন্ধ্যায়, রাতে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আলোচনা জমে ওঠে। ফুকুয়োকার কথাবার্তা মতামত কারো পছন্দ হয়, কারো বা হয় না। গভীর উপলব্ধি আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ফুকুয়োকা তাঁর নিজস্ব মতামত ও জীবনদর্শন ব্যক্ত করে যান। ফুকুয়োকা বলেন, লোকে ক্ষেতিকর্মে প্রাকৃতিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে অল্প আয়াসে অল্প সময়ে যথেষ্ট ফসল ফলাবে। চাষীরা গান বাঁধা, কবিতা রচনা বা প্রকৃতির মধ্যে অরণ্যে সানন্দে বিচরণ করবার অবসর পাবে। তাঁর বিশ্বাস নদীর কুলুধ্বনি, পত্রের মর্মর, পাখীর কাকলি—সবই অত্যন্ত সুন্দর ও মানুষের জীবনকে মধুরতর করে। তিনি বলেন, চল্লিশের দশকের আগে জাপানে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনে সুখ ও আনন্দ বেশী ছিল। যুদ্ধের পর আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর আমেরিকান ধাঁচের উন্নয়নের ধারা সারা জাপানের অর্থনীতি, মানব পরিবেশ ও মানুষের জীবনকে বিকৃত ও উল্টোপথেই নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, জীবনে আনন্দ আর অবসর কমছে, পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়াকে ফুকুয়োকা মনে করেন রোগ না সারিয়ে রোগের লক্ষণ চাপা দেবার ভ্রান্ত / ব্যর্থ চেষ্টা।

ফুকুয়োকা যে বহুজাতিক সংস্থা ও বড় বড় আধুনিক কোম্পানীর বিরোধী তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ক্ষেতিকর্মে পুঁজিবাদ বিরোধী চরিত্র সুস্পষ্ট। নিজেদের মুনাফার স্বার্থে পুঁজিপতিরা প্রাকৃতিক ক্ষেতিকর্মের চেষ্টাই করেনি, সনাতন কৃষি, পশুপালন ও পোলট্রির বিকল্প না ঘটিয়ে শিল্পীয় কৃষির (Industrial Agriculture, Animal Husbandry, Poultry) প্রবর্তন করেছে। এতে এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি আর এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদিতে (যথা : ধান, গম, মাংস, ডিম, দুধ) পরিণত হয় এবং আমরা তাদের খাদ্য বলে গ্রহণ করি। ফুকুয়োকা বলেন, ঐ সব "খাদ্যে" (!!) পেট হয়তো ভরে, কিন্তু মন ভরে না, রসনার তৃপ্তি হয় না, এবং মনুষ্য দেহ কিছু মূল্যবান ভেষজ ও পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে মানুষের দেহ ও মন দুই-ই অসুস্থ হয়। যেমন পোলট্রির মুরগীর ডিমের কুসুম অপেক্ষাকৃত জোলো, সাদাটে ও স্বাদহীন ; কিন্তু প্রকৃতির কোলে তার নিয়মে বেড়ে ওঠা মুরগীর ডিমের কুসুম সুস্বাদু, অপেক্ষাকৃত শক্ত ও সুন্দর কমলা রঙের। ফুকুয়োকার পূর্বোক্ত বইটিতে চিত্তাকর্ষক বহু বিচিত্র এবং বহুলাংশে সঠিক খবর ও আইডিয়া পাওয়া যাবে।

ফুকুয়োকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ক্ষেতের 'সাইজ' নিয়ে। তিনি বলেন ছোট ক্ষেতই বেশী উৎপাদনশীল। অথচ সরকারি নীতি ও নয়া কৃষি প্রযুক্তি ছোট চাষীকে মেরে, ছোট খামারের উচ্ছেদ ঘটিয়ে বড় বড় ক্ষেতের সৃষ্টি করছে যেখানে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এগ্রিকালচার" করা যায়। ফুকুয়োকা বলেন, পাঁচ জনের পরিবারের জন্য সওয়া-একর জমি হলে তার উৎপন্নেই সারা বছর চলতে পারে। যুদ্ধের ঠিক পরে জাপানে শতকরা 70 থেকে 80 ভাগ লোক কৃষিকর্ম করত। তারপর মার্কিনী উন্নয়নধারা ও নয়া কৃষি প্রযুক্তি আসতে থাকলো। কৃষিতে নিযুক্ত লোকের অনুপাত কমতে লাগলো : 50 শতাংশ থেকে 30, 20 থেকে বর্তমানে 10 শতাংশেরও কম। শিল্পোন্নয়ন বেড়েছে, তাতে লোক চাই। শিল্পে মন্দা এলে বেকারি বাড়ে, কৃষিতে থাকলে তা হয় না। উন্নয়নের আধুনিক ধারা, কৃষি বিজ্ঞান গবেষণাদি সম্পর্কে ফুকুয়োকা বীতশ্রদ্ধ। অসময়ে কোন সব্জী বা ফল উৎপন্ন করে বেশী দাম পাওয়া, পেষ্টিসাইড প্রয়োগ করে সব্জী বা ফলকে নিখুঁত সুন্দর চকচকে করে বেশী দামে বেচা, মোম বা রঙ প্রয়োগ করে খাদ্যদ্রব্যাদিকে মনোহারি করে লোকের 'পকেট কাটা'—এসবই মুনাফার স্বার্থে করা হয়। এইসব নানা কারণে ফুকুয়োকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানী, সরকারি কৃষি দপ্তর ও কৃষি কোম্পানীগুলির উপর বিষম খাপ্পা। তিনি এক জীবন্ত আদর্শ। এক মূর্তিমান বিদ্রোহ। □

সবুজ সম্ভাবনা

সবুজদের রাজনীতি তথা চিন্তাভাবনার এই ধারাবাহিক পরিচিতির বর্তমান অংশে থাকছে সবুজদের কয়েকটি মৌলিক নীতির পরিচয়—ইকলজি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, শিকড়-ঘেঁষা গণতন্ত্র, অহিংসা, বিকেন্দ্রীকরণ, পুরুষ-কর্তৃত্ববাদের অবসান, এবং আত্মিকতার পুনরুজ্জীবন।

সবুজ রাজনীতির চিন্তাধারা অনেক মানুষের ভেতরই বেশ দানা বাঁধছিল, 'গ্রীন পার্টি' গঠন সংক্রান্ত ধ্যানধারণা আসার অনেক আগে থেকেই। যাঁরা পরমাণু চুল্লীর প্রসার, নদীদূষণ, বনের অপমৃত্যু ইত্যাদি প্রশ্নে মধ্য সত্তর থেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন—সেই নাগরিকদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, আমরা প্রকৃতিরই অংশবিশেষ—তার উর্দ্ধে নই—এবং আমাদের বাণিজ্যের বিশাল কাঠামো ও আমাদের জীবনপ্রণালী নির্ভর করছে জৈবজগত ও মানুষের মধ্যে বিচক্ষণ তথা শ্রদ্ধাপূর্ণ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল তথা ব্যবস্থার মধ্যে ইকলজিভিত্তিক জ্ঞান, প্রকৃত নিশ্চিত শান্তি, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অর্থনীতি এবং সর্বজনীন অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের (participatory democracy) অনুপস্থিতি দেখিয়ে গ্রীনরা তাঁদের ফেডারেল কর্মসূচি শুরু করেন এই বলে যে—

" 'বন্'-এর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত রাজনৈতিক দলই মনে করে যেন এই পরিমিত বিশ্বে, অপরিমিত শিল্প উৎপাদন সম্ভব। তাদের ঘোষণা অনুযায়ীই, তারা আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে পরমাণু রাষ্ট্র না পরমাণু যুদ্ধ—হারিসবার্গ না হিরোসিমা—এই আশাহীন বেছে-নেওয়ার দিকে। পৃথিবীব্যাপি পরিবেশ-ভারসাম্য-সঙ্কট দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে, রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ ফেলা নিয়ে সঙ্কট ঘনিয়ে উঠছে। বন্যপ্রাণীরা সমস্ত প্রজাতি ধরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। নানান প্রজাতির গাছেরা ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। নদী আর মহাসমুদ্র পরিণত হচ্ছে নর্দমায়। আর মানুষেরা এক পরিণত শিল্পনির্ভর এবং পণ্যভিত্তিক সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আত্মিক তথা বুদ্ধিগত ক্ষয়ের দিকে ঝুঁকছে। আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যাচ্ছি এক অন্ধকারময় উত্তরাধিকার··· ।

আমরা প্রতিনিধিত্ব করি এক সামগ্রিক ধারণার যা, একমাত্রিক, অর্থাৎ 'আরো বেশী উৎপাদন'-মার্কা রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আমাদের কর্মপন্থা এক দূরদর্শী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়, যার ভিত্তি হল চারটি প্রাথমিক নীতি—ইকলজি, সামাজিক দায়িত্ববোধ, শিকড় অবধি প্রসারিত গণতন্ত্র (grassroots democracy) এবং অহিংসা।"

ইকোলজি :

গ্রীন রাজনীতিতে, প্রথম নীতি অর্থাৎ ইকলজির ব্যাখ্যা বহুবিধ এবং যাদের একত্রীকরণে একটা বোধ 'গভীর ইকলজি'—যা অপ্রচলিত নতুন চিন্তাধারার এক জগতকে সামনে তুলে ধরে। পরিবেশ সংরক্ষণবাদ-এর স্থিতাবস্থাকে কাটিয়ে এই বোধ নিয়ে এসেছে আরো এক বিস্তৃত চিন্তাধারার জগৎ। প্রকৃতির নিজের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মানুষের সাথে তার প্রতিক্রিয়া এবং মানুষের নিজেদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক—এই নিয়ে দূরূহ জালের যে বুনন—তার মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় গভীর ইকলজি'র ধারণা।

আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য—সব ব্যাপারেই 'গভীর ইকলজি'র প্রভাব রয়েছে। পরিবর্তনহীন, কঠিন গঠনের ধারণার বদলে ইকলজি এনেছে প্রকৃতির এক ক্রমপরিবর্তনশীল গতিময় রূপের ধারণা। আন্তঃসম্পর্কময়তা তথা বহমানতার ধারণা আমাদের চারপাশের ইকোসিস্টেমে ব্যবহার করতে চান গ্রীনরা। তাই তাঁরা শক্তি উৎপাদনের প্রকৃতিনির্ভর ধারা অর্থাৎ সূর্য, হাওয়া বা নদীর স্রোতকে ব্যবহার করতে চান—চান জৈব কীটনাশক বা পুনরুৎপাদনযোগ্য কৃষিব্যবস্থা। সর্বোপরি গ্রীনরা প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠন করা, বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের আস্তাকুঁড় করা, জৈব জগৎকে বিষাক্ত করা, তেজস্ক্রিয়তার তথাকথিত নিরাপদ মাত্রা এবং বায়ুদূষণ বন্ধের দাবী জানায়। এই ধারণা আরো দূর অবধি বিস্তৃত হয়ে পরিণত হয়েছে সামাজিক ইকলজিতে—যেখানে ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্তরযুক্ত সামাজিক সম্পর্কের বদলে মানুষে মানুষে সম্পর্কের এক নতুন আত্মিক বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'সিস্টেম' বা আরো গুছিয়ে বললে 'নেটওয়ার্ক' নামক ধারণাটি গ্রীনদের ইকলজিভিত্তিক চিন্তাভাবনার মধ্যে একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে, আন্তঃসম্পর্ক তথা আন্তঃনির্ভরশীলতা একটি সিস্টেমের টুকরো টুকরো অংশগুলোর বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হিসাবে দেখানো যায়। যে কোনো সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এই স্বীকৃতি প্রয়োজনীয় যে, তার অংশগুলোর যোগফলই শুধু সামগ্রিকতা নয়—সামগ্রিকতা অখণ্ডনীয় এবং এক অংশের ধ্বংসে সমগ্র সিস্টেমই তার বৈশিষ্ট্য হারাবে। তাই একটি দিক প্রধান বা অন্যটি অপ্রধান—কোনো সমস্যাকে এইভাবে বোঝা নয়, ইকলজি শেখায় সংকটগুলো একে অন্যের সাথে জড়িয়ে রয়েছে এবং একে বুঝতে হবে সে'ভাবেই। গ্রীনদের প্রচারে সবসময়ই এসে পড়ে ইকলজিভিত্তিক ধ্যানধারণার মূর্ত প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে গোটা পশ্চিম জার্মানী জুড়েই অ্যাসিড বৃষ্টি নিরোধে গ্রীনদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য ('ব্ল্যাক ফরেস্ট' অঞ্চলে বন্যসম্পদ ধ্বংস হওয়ার কথা সংবাদ মাধ্যমের সূত্রে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল), এবং এই প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক সহায়তার দিকটিও তুলে ধরেছিল কারণ অ্যাসিড বৃষ্টি দেশগত সীমানাকে ছাড়িয়ে, ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্বজার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশে। এর পাশাপাশি দেশজোড়া রাসায়নিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রশ্ন তোলেন গ্রীনরা। ভয়ংকর বিষাক্ত 'ডায়োক্সিন'-এর

কয়েক ডজন পিপে উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গ্রীনরাই প্রথম তদন্তের দাবী তোলে। পরিচ্ছন্ন জৈব কৃষির পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিরোধিতা করেন যন্ত্রনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিব্যবস্থার, তার দূষণগত দিকগুলো দেখিয়ে। ইকলজিভিত্তিক শহর বা ব্যক্তিগত বাসস্থানের পরিকল্পনা থেকে একটি 'মডেল গ্রাম' তৈরীর প্রচেষ্টায় তাঁরা '83-84 সাল থেকেই কাজ শুরু করেছেন।

সামাজিক দায়িত্ববোধ :

সামাজিক দায়িত্ববোধ বলতে অনেক গ্রীনই মনে করেন যে, এ হল সামাজিক ন্যায়বিচার, ইকলজিগত চিন্তা চেতনায় পণ্যভিত্তিক সমাজকে বদলানো বা অর্থনীতির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে দরিদ্র তথা খেটে খাওয়া মানুষের কোনোরকম ক্ষতি না হবার প্রতিশ্রুতি। সীমিতভাবে হলেও, এই ধারণাটি বিসমার্কের সময় থেকেই জার্মানীতে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির মোকাবিলায়, কিছু কিছু জনমুখী আইন তৈরী হয়। যেমন সেই সময়ে একটি আইনবলে রেস্তোরাঁ ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য কাজের দিন সন্ধ্যে ছ'টায়, শনিবার দুপুর দু'টোয় এবং রবিবার পুরো বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়, যাতে শ্রমিক কর্মচারীরা অবসর সময়ে পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারে। সামাজিক দায়িত্ববোধের অন্য এক অর্থ গ্রীনদের মধ্যে একটি অংশ করেন—তা' হল এক ধরনের সমাজতন্ত্রের ধারণা। এই কারণেই গ্রীনপার্টির চরিত্র আপাত বিরোধী। তবুও এক-সাথে সংখ্যালঘু ও মহিলাদের সামাজিক অধিকার রক্ষার লড়াই বা চারলক্ষ বিদেশী শ্রমিকদের নিয়ে সুস্থ চিন্তাভাবনায় তাঁরা ঐক্যবদ্ধ। বিভিন্নমতা-বলম্বী গ্রীনেরা তাই এক সুরে বলেন, সামাজিক তথা অর্থ নৈতিক এবং ইকলজিভিত্তিক সমস্যাগুলো গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের জন্য অর্থনীতি আর প্রকৃতির জন্য অর্থনীতি একে অন্যের সাথে খারাপ বা ভালো—দু'দিকেই জুড়ে আছে।

শিকড়-ঘেঁষা গণতন্ত্র (grassroots democracy) :

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের পরিবর্তে গ্রীনরা চান এক সোজাসুজি অংশ-গ্রহণকারী গণতন্ত্র, যেখানে নিয়ন্ত্রণ তথা ক্ষমতা বেশী বেশী থাকবে সংগঠনের ভিত্তিস্বরূপ স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর হাতে। প্রাথমিক নীতিগুলো যতটা সম্ভব বড় জমায়েতে, ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হবে। স্থায়ী কর্মকর্তার বদলে নির্বাচিত করা হবে কমিটি, যার সদস্যদের পরিবর্তন করা হবে সময়ের সাথে সাথে। নাগরিক আন্দোলনের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করতে গিয়ে গ্রীনরা দেখেছেন যে, অনেক কর্মীই রাজনৈতিক দলে সরা-সরি যোগ দিতে চান না। তাই গ্রীনদের ভিত্তিভূমির মধ্যে অসদস্যদের জায়গা আছে। কিছু কিছু স্থানীয় সংগঠন এঁদের দলের সভায় ভোট দেবার অধিকারও দিয়েছে। ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্তরযুক্ত ব্যবস্থার বদলে, নানান পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিকড় ঘেঁষা (grassroots) গণতন্ত্রের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান গ্রীনরা।

গ্রীনদের কাছে শেকড় ঘেঁষা (grassroots) গণতন্ত্রের প্রধানতম অসুবিধাগুলোর মধ্যে একটি হল আবর্তন-নীতির (rotation principle) প্রয়োগ। ক্ষমতাকেন্দ্রিক আমলাতান্ত্রিকতাকে ধ্বংস করার জন্যে, গ্রীনরা চান প্রত্যেক কার্যনির্বাহী সদস্য একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর (সাধারণত দু'বছর) আবর্তিত হোক।

আবর্তন-নীতির পক্ষে মতামত—আট বছর, এমনকি চার বছরও কোন ব্যক্তি রাজ্য বা জাতীয় সংসদে কাটাবার পর তাঁদের চিন্তাধারা প্রবলভাবে গোঁড়া ও একমুখী হয়। গ্রীনরা চাননা তাঁদের সদস্যরা, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদদের মতো তিন দিন আগে বলা কথা, আজকে ভুলে যান। মেয়াদের দীর্ঘতাই তথ্য ও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে, যা শিকড় ঘেঁষা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

আবর্তননীতির বিপক্ষে মতামত—গ্রীনরা অধিকাংশ সময়েই নতুন নতুন মৌলিক ভাবনা চিন্তা, সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। রাজ-নৈতিক মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীনদের জানতেই হবে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিরোধীদের কোণঠাসা করার উপায়গুলো, যা সম্ভবপর হবে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার আলোকেই। একজন নতুন সংসদ সদস্যের অন্তত এক বছর লাগে এইসব কূটনৈতিক ব্যাপার শিখতে এবং দলের দক্ষতা ব্যাহত হয় যদি প্রতি বছরই এই রাজনৈতিক শিক্ষানবিশী চলতেই থাকে। এর ফলে দল হারায় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, প্রভাব এবং সর্বোপরি সুবক্তাও।

গ্রীনদের মধ্যে এই মতবিরোধ কাটিয়ে ওঠার জন্য, বিতর্ক ও সমঝো-তার প্রক্রিয়ায় কিছু ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

অহিংসা :

গ্রীনদের চতুর্থ মৌল নীতি অহিংসা। এ প্রসঙ্গে তাঁদের প্রচেষ্টা হল কাঠামোগত হিংসা (structural violence) এবং ব্যক্তি-গত হিংসা—উভয়েরই বিলুপ্তি। রাষ্ট্র তথা প্রতিষ্ঠানগত হিংসার বিরুদ্ধতায় গ্রীনরা ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে দাঁড়ান। তাঁরা স্কুলে শান্তিসংক্রান্ত পাঠক্রম চালু করতে চান, যা শেখাবে দ্বন্দ্বের অহিংসা-মূলক মীমাংসা। গ্রীনদের মতে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে সৈনিকের যে ছবি গেঁথে দেওয়া হয়, তা' স্বাভাবিক নয়—এ হলো এক বিশেষ সংস্কৃতির ফল। নারী শিশু বা সংখ্যালঘুদের উপর দমন-পীড়ন, যা পুরুষ কর্তৃত্ববাদী সমাজের সহজাত প্রবৃত্তি—গ্রীনরা এর অবসান চান। গ্রীনরা মনে করেন প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্ক হওয়া উচিৎ যথেষ্ট ভারসাম্য এবং শ্রদ্ধামূলক—হিংসাপূর্ণ নয়। পেত্রা কেলী'র মতে ইকলজিভিত্তিক সমাজে 'হিংসা না থাকা' একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

যদিও গ্রীনরা নীতিগতভাবে অহিংসায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তবুও তাঁরা মনে করেন, অহিংসানীতির প্রয়োগ যথেষ্ট সমস্যাসংকুল। রোনাল্ড ভল্ট্-এর মতে—"আমরা এখনো এটার সমাধান করতে পারিনি যে, আমরা কী ভাবে নিজেদের অহিংস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবো, যখন নিজেরাই বিভিন্ন সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করবো কারণ রাষ্ট্র নিজেই প্রতিষ্ঠানগত হিংসার জনক।"

হিংসা বিরোধিতার সবচাইতে বড় ক্ষেত্র হল রাষ্ট্র তথা সমর শিল্প-কেন্দ্রিক নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং এই ক্ষেত্রে গ্রীনরা বিশেষভাবে সক্রিয়। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল গের্ট বাস্তিয়ান, যিনি সমরবাদের বিরুদ্ধে শান্তি সংক্রান্ত গ্রীন কর্মসূচী তৈরীর একজন প্রধান স্থপতি, তাঁর মতে—'পরমাণু যুগে সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার কোন নৈতিক যুক্তি নেই। মানুষ যা যা ভালবাসে, তা' রক্ষা করার জন্যই সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন—পরমাণু যুগে এই যুক্তি ধোপে টেকে না কারণ পরমাণু যুদ্ধের পর সবই শেষ হয়ে যাবে।'

অহিংসার প্রশ্নটি বোঝা এবং ব্যবহারের প্রশ্নে, গ্রীনদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে। হিংসার মধ্যে দিয়ে অহিংস সমাজ তৈরী করা যায় কি না কিংবা অহিংসা ও অস্তিত্ব সমার্থক কিনা ইত্যাদি প্রশ্নেও মত-পার্থক্য রয়েছে।

পেত্রা কেলীর মতে—

'অহিংস ক্রিয়াকলাপের মাঝে বিরাট শক্তি লুকিয়ে থাকে।' অনেকেই মনে করেন যেন তা অক্ষমতা, বাধ্যতা এবং ভিক্ষাবৃত্তির জন্ম দেয় এবং অহিংসার মাধ্যমে কিছুই পাল্টানো সম্ভব নয়। তাঁদের ধারণা যেন সব কিছুই ব্যবহারযোগ্য। কিন্তু এই মহাবিশ্বে কিছু জিনিস থেকেই থাকে যার অপব্যবহার হওয়া উচিৎ নয়, এমন কি ব্যবহারও নয়। অহিংসা কখনই আপসে মীমাংসা শেখায় না।'

জুরগেন্ রীণ্টস্, বুন্দেস্টাগ-এর একজন গ্রীন সদস্যের মতে—'আমি মনে করি না, জঙ্গী প্রতিরোধের মাধ্যমে সমরসজ্জার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি, একমাত্র রাজনৈতিক ভাবেই অর্থাৎ একমাত্র বেশী বেশী করে জনমত সংগঠিত করে যুদ্ধ উন্মাদনা বন্ধ করা যায়। অনেকেই মনে করেন, অহিংসাই পরম ধর্ম কিন্তু আসলে তা এক পবিত্র অধিবিদ্যা, যা মানুষকে আত্মবলির দিকেই ঠেলে দেয়। আমি এই ভেবে শঙ্কিত যে পরিশেষে একজন মানুষ নৈতিকভাবে সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকলেও রাজনৈতিক-ভাবে তিনি বিফলই হবেন।'

কিছু মানুষ মনে করেন যে বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটি গ্রীনদের পঞ্চম নীতি হওয়া উচিৎ। সমস্ত গ্রীন প্রস্তাবই এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক শক্তিগুলির জটিল ক্রিয়া-কলাপের উপর মানুষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। গ্রীনরা বলেন, অভেদ্যতা এবং অজ্ঞেয়তার মাঝেই লুকিয়ে থাকে বিভিন্ন আর্থিক কিংবা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, যার ফলে গণতান্ত্রিকতা ধ্বংস হয়। তাই অতি আমলাতান্ত্রিকতা বা ক্ষমতাকাঠামো নাগরিকদের উদ্যোগকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং শিল্পনির্ভর সমাজে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে সাধারণ ঝোঁক দেখা যায়। এর বিরুদ্ধে সরল ও ছোট-এলাকা-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা অনেক বেশী নাগরিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বদলে সাংস্কৃতিক ও ইকোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যভিত্তিক অঞ্চল তাঁদের কাছে বেশী আকর্ষণীয়। এই ধারণার বাস্তব প্রকাশ অনেক সময়ই জাতীয় সীমানা পার হয়ে যায়। ড্রেইকল্যাণ্ড এলাকার স্থানীয় মানুষ ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীতে বিভক্ত। কিন্তু পরিবেশ দূষণের মতো বিষয়ে তাঁরা একসাথে কাজ করেন।

বিশেষভাবে গ্রীনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পুরুষ কর্তৃত্ববাদী সমাজে, নারী নির্যাতনের বিষয়টি। তাঁদের কর্মসূচী পুরুষ-নারী বিভেদ জনিত অসাম্যমুক্ত। পুরুষ কর্তৃত্ব কাটিয়ে উঠে, এক বৈষম্যহীন নতুন সমাজ সৃষ্টিতে তাঁরা দায়বদ্ধ। তাঁদের কাজকর্মে নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁরা কিছু নীতি গ্রহণ করেছেন, যদিও পুরুষ কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতির টান এ ব্যাপারে নানান অসুবিধার সৃষ্টি করছে। গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন বা বিবাহোত্তর ধর্ষণের প্রশ্নে জাতীয় স্তরে বিতর্ক তুলতে গ্রীনরা সক্ষম হয়েছেন। সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও সবুজ রাজনীতিতে মহিলা অংশগ্রহণ অন্যান্য যে কোনো দলের চাইতে বেশী, এবং নারীবাদী ধ্যানধারণা ও ইকোলজির আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করারও চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে পেত্রা কেলীর বক্তব্য: 'আমি গভীরভাবে দুঃখিত হই যখন অনেকে বলেন, ইকোলজির সাথে নারীবাদী ধ্যানধারণা (**Feminism**)-এর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা জানেন না, তাঁরা কী বলছেন। আসলে ইকোলজিই **Feminism** এবং **Feminism**-ই ইকোলজি—এটাই কোনো কিছুকে দেখার পবিত্রতম রূপ।'

আরো একটি ব্যাপারে গ্রীনরা প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, যা হল আত্মিক ক্ষয় বা আত্মিক দারিদ্র্যের প্রশ্নটি। পণ্যভিত্তিক সংস্কৃতির চাপে মনন-শীলতার যে ধারাটি মরে যেতে বসেছে তার বিরুদ্ধে স্কুল পাঠক্রম থেকেই এক ধরনের চর্চার প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁরা। রাজনীতির যে নৈতিক ও আর্থিক মাত্রা থাকা উচিৎ সে ব্যাপারে বহু মানুষই একমত। এ প্রসঙ্গে এরিক ফ্রোম রচিত 'টু হ্যাভ্ অর টু বি' বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যেখানে ভোগ বা সুখসর্বস্ব এক ধরনের মালিকানাভিত্তিক জীবন-যাপনের বদলে 'সব কিছুর থেকে আনন্দ পাওয়া'—এইভাবে বাঁচার কথা বলা হয়েছে।

ইকলজি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, শিকড় ঘেঁষা গণতন্ত্র, অহিংসা, বিকেন্দ্রীকরণ, পুরুষ কর্তৃত্ববাদের অবসান এবং আত্মিকতা—সবুজ রাজনীতির এই যে সাতটি মৌলনীতি, তা প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমস্তকিছুই যা বিমূর্ত এবং মূর্ত, ব্যক্তিগত এবং রাজনীতিগত, অর্থনৈতিক কিম্বা সামাজিক—তা সবই রয়েছে ক্রমপরি-বর্তনশীলতার পথে। সবুজ রাজনীতি উত্তরণের কিম্বা পরিবর্তনের একটি পর্যায়—যা থাকবে চিরকালই চলমান পথে—এক স্বপ্নময় ভবিষ্যতের দিকে। এর রূপ ক্রমশ আকার পাচ্ছে—একটি ইকলজিভিত্তিক সমাজ।□

সুমিত বিশ্বাস

অজয় মুখার্জী

সুরঞ্জন কর

India's Nuclear Estate (ধীরেন্দ্র শর্মা)
বইটির ধারাবাহিক পরিচিতির চতুর্থ অংশ

পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প

পরিচালন ব্যবস্থা—বিভিন্ন পর্যায়ে

রাশিয়া-আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প বেশ কিছুটা নিরীহ প্রকৃতির ছিল। তখন বলা হত (বিশ্বাস করা হত কিনা জানিনা)—কোন পরিস্থিতিতেই আমাদের দেশে এই শক্তি-কেন্দ্রকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না। ষাটের দশকের শুরু অবধি এই প্রযুক্তিতে আমাদের অগ্রগতি হয়েছিল যথেষ্ট—আশ-পাশের দেশের তুলনায় তো চোখ ধাঁধান গোছের। অবশ্য আমাদের শিক্ষা, শ্রম আর অর্থের একটা বড় অংশ তখন ঐ খাতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষত বিদেশের আলো-হাওয়ায় প্রস্ফুটিত এদেশীয় তরুণ বৈজ্ঞানিকরা একাজে অনেকটাই সাহায্য করেছিল। শুরুর পর্বের সোচ্চার ঘোষণা সত্ত্বেও এক সময় পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের পিছনের চিন্তা-ভাবনা ক্রমে পাল্টাতে শুরু করে। '64 সালে চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পরেই এই পরিবর্তন এল। এই ঘটনার পর ভারতের কর্ণধারেরাও সম্ভবত '66-67 সালের মধ্যে অনুরূপ লক্ষ্যে পৌঁছনর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ভারতের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের কর্ণধার, ভাবার, হঠাৎ-মৃত্যু সবকিছু বড় অগোছালো করে দেয়। কারণ তখনও পর্যন্ত DAE ব্যক্তিবিশেষের মতামতকেই বেশী গুরুত্ব দিত। ভাবার মৃত্যুর পর কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

প্রথম প্রথম ক্ষমতার বিচারে এটমিক এনার্জী কমিশনের (AEC) তিন কমিশনারই সমান ছিলেন। কমিশনার এই তিনজন ছিলেন বৈজ্ঞানিক ডঃ কৃষ্ণাণ, ডঃ ভাটনাগর এবং ডঃ ভাবা। আর দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা সংগঠনগুলোও পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। কিন্তু '58 সালের পর থেকে সমস্ত কর্তৃত্ব চলে যায় AEC-এর প্রধানের উপর। ফলে এর পর থেকে সম্পূর্ণভাবে ভাবার ব্যক্তিগত চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই চলতে থাকে আমাদের দেশের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের কাজ।

ডঃ ভাবার পরবর্তী চেয়ারম্যান বিক্রম সারাভাই আসাতে পরিস্থিতির কিছুটা বদল হয়। সেটা '66—'71 সাল। তিনি DAE-এর এতদিনের কাজকর্মের ধারা কিছুটা বদলাতে সচেষ্ট হন। তিনি চেয়েছিলেন এই প্রকল্প ঘিরে অহেতুক গোপনীয়তার আবরণ কিছুটা খুলে দিতে। কিন্তু এ কাজে তিনি সফল হতে পারেননি। বাধা এসেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকেই।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়—AEC-র প্রথম দশ বছরে এর তিনজন সদস্যই ছিলেন বৈজ্ঞানিক। এরপর থেকে বৈজ্ঞানিক সদস্যের সংখ্যা কমতে থাকে। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক এই সদস্য পদ অলঙ্কৃত করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সরকারী কর্মচারী (শুধুমাত্র '77—'78 সালে একজন বেসরকারী বৈজ্ঞানিক ছিলেন)। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা যায় না। আর AEC , DAE এবং পারমাণবিক শক্তি মন্ত্রক তো প্রকৃতপক্ষে একই কাঠামোর তিনটে দিক। এবং এদের কোন কিছুর জন্য কারো কাছে জবাবদিহির বালাই নেই। ফলে গোটা সংগঠনটাই একটা সমাজবিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যের মত হয়ে ওঠে।

সারাভাইও ভাবার মত ব্যবসায়ী পরিবারের মানুষ। তথাপি সম্ভবত স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সরাসরি যোগাযোগের জন্যই দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বেশ ফারাক দেখা গেছে। সারাভাই সত্যিই পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে (!) উৎসাহী ছিলেন। তাই মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরিকল্পনা তাঁর আমলে একেবারেই ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শক্তি সমস্যার সমাধানে পারমাণবিক প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই প্রকল্প রূপায়ণে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী ছিলেন। প্রশাসনিক স্তরে নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং দেখেছিলেন ক্রমে তা বেড়েই চলছিল। তাই পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু করার জন্য Programme Analysis Group বা সংক্ষেপে PAG গঠন করেন। এই গ্রুপ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে DAE-এর সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ আর সরবরাহের কাজ করবে ঠিক হয়েছিল। যদিও কিন্তু কার্যত এটি DAE-র একটি শাখাবিশেষেই পরিণত হয়। '68 থেকে '71 পর্যন্ত এই সংগঠনের কাজ ছিল প্রায় নজরদারের মতোই।

সারাভাইকে তাঁর একটা কাজের জন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তাঁর প্রচেষ্টাতেই AEC প্রথম তার পরিকল্পনা আর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে বক্তব্য রেখেছিল। কিন্তু '71-এর শেষে হঠাৎই তিনি মারা যান। এই মৃত্যু একটু অস্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু কারণ আজও জানা যায়নি। সারাভাই-এর মৃত্যুর পরই DAE-এর ঘাড় থেকে PAG-কে ঝেড়ে ফেলা হয়, অন্যদিকে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দেয়।

'77—'79 সালে খোল-নলচে বদলে AEC-কে আবার নতুন করে সাজানোর কথা ভাবা হয়। তখনকার প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, ডঃ আত্মারামকে নিযুক্ত করেন তাঁর এই কাজে সাহায্য করার জন্য। তাঁদের AEC ঘিরে গোপনীয়তার জাল পুরোপুরি ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্য ছিলনা ঠিকই। কিন্তু এর একচেটিয়া প্রাধান্য খর্ব হোক —তাঁরা চেয়েছিলেন। তাই এর দায়িত্ব বিভিন্ন হাতে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। ডঃ আত্মারাম-এর অভিমত ছিল পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প—শিল্প আর বিদ্যুৎ বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনেই থাকা উচিৎ! কিন্তু তখনকার AEC-এর প্রধান মিঃ সেঠনা, কিছুতেই আত্মারামকে বেশীদিন বহাল রাখতে রাজী হলেন না। আর সে সুযোগ আসতে বেশী দেরী হল না। জনতা সরকারের দিন ফুরাল '79 সালে। AEC পুনর্গঠনের উদ্যোগও ধামাচাপা পড়ল। □

ভাবানুবাদ : **অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়**

যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর হতে পারে। ডুমুর ও বটের ফুল অবশ্যই আছে, যদিও তাদের পুষ্পাধার (receptacle) গোল হয়ে মাথার দিকে গুটিয়ে নেমে আসে এবং পরে সেটিই হয়ে যায় অনেকগুলি ফলের সাধারণ বহিরাবরণ। বাতাসে গন্ধকের যৌগ হাইড্রোজেন সালফাইড সামান্য পরিমাণে থাকে এবং তা রূপোকে কালো করে ঠিকই, কিন্তু সেজন্য 'বাতাসে গন্ধক, গায়ের ঘামেও গন্ধক' আবিষ্কারের প্রয়োজন পড়ে না। স্লেট একরকমের রূপান্তরিত নরম শিলা এবং পাহাড়ী অঞ্চলে মাটির উপরিভাগেই সাধারণত পাওয়া যায়। 'খাল-বিল জলাশয়ের কাদার নীচে' স্লেট খুঁজতে শিশুরা আবার বেরিয়ে না পড়ে! পরিশুদ্ধ ধাতু হিসেবে উদ্ধার করতে সোনাকে কখনও কখনও দ্রবণে পরিণত করতে হয়, বা বিচূর্ণ বালি, পাথর ও ধাতু জলের স্রোতে ধুতে হয়, কিন্তু তা কখনই সোনার তরল অবস্থা নয়।.....বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শরীর ও মনের সুখাবস্থাকে স্বাস্থ্য হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। দূষিত জলকে কলেরা ও টাইফয়েড রোগ ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে মেনে নেওয়া যায়, যক্ষ্মা'র ক্ষেত্রে একথা মেনে নেওয়া যায় না।...কানে সরষের তেল দিলে কি উপকার হয় সঠিক জানা নেই, তবে ভালভাবে পরিষ্কার না করলে ঐ তেলই ময়লা জমা ও সংক্রমণের কারণ হ'তে পারে। কান পরিষ্কার করার জন্য 'কান খুচানী' ব্যবহারের পরামর্শে শিশুরা নোংরা শক্ত কাঠি বা শিক ঢুকিয়ে বিপদও ডেকে আনতে পারে। খাবার হজম কিংবা রক্ত-মাংস তৈরী হওয়ার ব্যাপার মানবদেহে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, শুধু ঘুমের মধ্যেই এগুলি ঘটে এমন তো নয়ই, এমনকি ঘুমের সময় এসব প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় বা সুষ্ঠুভাবে হয়, একথা বলারও কোন ভিত্তি নেই।.....

'লতিয়ে চলা উদ্ভিদকে লতা বলে' কিংবা 'যে শিরা দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে শিরা বলে' জাতীয় সংজ্ঞা পড়ে এমনিতে হয়তো হাসি পেতে পারে, কিন্তু এগুলি প্রমাণ করে বইগুলি কতখানি অবহেলা বা তাচ্ছিল্য নিয়ে রচিত বা প্রকাশিত। আর তাই হয়তো পয়লা মে 'শ্রমিক দিবস' না হয়ে 'শ্রমিক' ছাপা হয়ে যায়।

শিশুদের জ্ঞানে যাতে ঘাটতি না হয় তার জন্য পৃথিবীর উৎপত্তির তত্ত্ব বা আদিম মানুষের সভ্য হবার প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বইগুলিতে কী সব অসাধারণ ভাষাই না প্রয়োগ করা হয়েছে! 'একদল প্রাণী হঠাৎ একদিন মাটিতে নেমে...দু পায়ে ভর দিয়ে...হাঁটতে লাগল'। হাজার হাজার বছরের বিবর্তন যেন একদিনের 'সৃষ্টি' হিসেবে নবাবিষ্কৃত হল! বড় কোন নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্যের থেকে একটা অংশ পৃথক হয়ে পরে ভেঙে নটা গ্রহ হ'ল, না নটা পৃথক অংশই বেরিয়ে এসেছিল তা কি শিশুদের না জানালেই নয়?

'আমরা বাঙালী', 'উড়িয়াদের মাথায় টিকি...', 'অপরকে খাটিয়ে নিজের সম্পত্তি' যারা বাড়াতে পারে তারা 'বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ', 'বাঙালী সমাজে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি' 'বড় কাজ' ইত্যাদি বর্ণনার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে বিভেদ-সাম্প্রদায়িকতা-শোষণের সংস্কার।

আদিম মানুষদের কোন বইতে 'শিম্পাঞ্জীর মত', কোন বইতে 'বনমানুষ' বলা হয়েছে। কিন্তু মজার কথা, কোন বইতেই বলা হয় নি 'বানরের মত'। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ, বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী বা ওরাং ওটাং —সকলেরই এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল, যারা ছিল লোমশ, চতুষ্পদ, বৃক্ষচারী, ফলমূলাহারী ও লেজ যুক্ত—এই স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যটুকুকে বিকৃতই করা হয় যদি আদিম মানুষকে বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জীর মত বলে বর্ণনা করা হয়। আর সেরকমভাবে যদি বলতেই হয়, তবে 'বানরের মত' বলাই হ'তো সহজ ও স্বাভাবিক। অভিব্যক্তিবাদের জনক ডারউইনকে বানরের বংশধর বলেই কত না ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে; মানুষকে বানর-বংশজাত বলায় কত না মামলা হয়েছে, এখনও হ'চ্ছে। তাছাড়া, গ্রাম-শহরের সব শিশুই 'বানরের মত' বললে একরকম ধারণা করতে পারে। তবুও, আশ্চর্য, বানর ছাড়া আর সবকিছুকেই তুলনায় আনা হচ্ছে। মনে হয় আদি মানবকে বানরের মত বলে বর্ণনা না করার পেছনে এখানে, এখনও কোন গভীর গণ-সংস্কার কাজ করে চলেছে।...কোন কোন বই-এ আদিম অধিবাসীদের আদিবাসী এবং আরও স্পষ্ট করে সাঁওতাল কোল ভীল ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করেছে—এটা আরও অর্থবহ। বইগুলি পড়ে মনে হয়, লেখকদের ধারণা, অন্যরা—অর্থাৎ আমরা—বহিরাগত আর্যদের বংশধর। আর্যদেরও যে একই রকম আদিম অবস্থা ছিল, এটা তাঁদের মাথায় আসে নি। পূর্বপুরুষদের "কদাকার" বলাও মোটেই সুরুচির পরিচায়ক নয়।

প্রধানত দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য লিখিত এই সব বইগুলির আরও কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়: ভূগোল-স্বাস্থ্য-সমাজ বিষয়ক বইগুলি প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রশ্নোত্তরে। ইতিহাস বইগুলি বেশীর ভাগই টেক্সট-সম্বলিত। অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নের অনুশীলনী আছে। কাগজ, ছাপা ছবি বেশ খারাপই এবং তুলনায় দামও বেশী। অসার, বিকৃত ও ভুল তত্ত্ব তথ্য এবং অসতর্কতা ছাড়াও, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, ও সামাজিক বৈষম্য এবং কোথাও কোথাও যুদ্ধবাজ মনোভাব স্পষ্ট। বেশীর ভাগ বইতেই ছেলের ছবি মেয়ের ছবির তুলনায় অনেক বেশী। একটি বইতে (ঘ) মোট প্রায় 50টি ছেলেমেয়ের ছবির মধ্যে মাত্র 4টি মেয়ের, আর একটিতে, (গ) 70টির মধ্যে 7টি। এমনকি দলবেঁধে বাচ্চারা স্কুলে বা ক্লাশে যাচ্ছে এমন যে চিত্র তাও অবধারিতভাবেই শুধুই ছেলেদের দল। একটি বইতে (ঙ) বরণীয় 'বাঙালী'র 19 জনের নামোল্লেখ করা হয়েছে, কোন 'বাঙালিনী' তাতে নেই; প্রায় ত্রিশটি যন্ত্রের পরিচয় দেওয়া আছে তার মধ্যে ন'টিই যুদ্ধ-যন্ত্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে (সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, ক্রুজার, মাইন ইত্যাদি)। আর একটিতে (চ) 16টি 'আবিষ্কারের কথা'র চারটি যুদ্ধাস্ত্র (আণবিক বোমা, রিভলভার, ডিনামাইট, হাইড্রোজেন বোমা)। 'সমাজবন্ধুদের' মধ্যে চাষী কামার শ্রমিক জেলে ইত্যাদি "ভাইরা" বা "দাদারা" (ন) সমাজের নানা উপকার "করে," কিন্তু শিক্ষক ও চিকিৎসক বা ডাক্তার "বাবুরা" উপকার "করেন" এবং এঁরা কেউ "ভাই" বা "দাদা", নন, যদিও চিত্রে এঁদের কেউই মহিলা নন!

এর উপর আছে ব্যবসায়িক জোচ্চুরি। লেখকের নাম ভিন্ন, বই-এর

নামে হয়তো সামান্য হেরফের অথচ ভেতরে বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হুবহু এক, এমন কয়েকজোড়া বই পাওয়া গেছে। কোন জোড়ার হয়তো প্রকাশকের একই নাম ও ঠিকানা (ছ/জ), কোন জোড়ার নাম আলাদা, ঠিকানা একই (ণ/ত), আবার কোন জোড়ার প্রকাশকের নাম ঠিকানা আলাদা (ত/থ, ণ/থ)। দুটি বই দেখা গেল যাদের প্রথম ও শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় অমিল, মাঝের পৃষ্ঠাগুলি অভিন্ন (ঞ/ট)।

সবদিক বিবেচনা করলে, বইগুলির ভুল-ত্রুটি, অসারতা-অসম্পূর্ণতা, প্রগলভতা, মাত্রাহীনতা ছাপিয়ে একটি কথাই বড় হয়ে দেখা দেয়—আমাদের শিশুরা কি পরিমাণ অযত্ন-অবহেলা-তাচ্ছিল্যের শিকার—বইগুলি তারই দর্পণ!

তবে আর একটা কথাও এখানে বলা উচিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য অন্তত একটি এমন বই দেখেছি যা ছবি, ছাপা, উপস্থাপনা, বিষয়বস্তু, দাম সব দিক থেকেই যথেষ্ট ভালো। নামোল্লেখ করাটা নিতান্তই প্রচার হয়ে যেতে পারে বলে বিরত থাকলাম। তাছাড়া, আশা করা যাক, ভালো বই আরো আছে।

চার॥ দ্বিতীয় শ্রেণীর বই-এর রমরমা বাজার

ভেবে অবাক না হয়ে উপায় নেই। আমাদের রাজ্যের শিশুরা কি অভিভাবকহীন? বাড়ীর অভিভাবকরাই তো শিশুদের একমাত্র অভিভাবক নন। এসব বই এভাবে ভূরি ভূরি ছাপা হয় কি করে? কারা লেখেন? কারা কিভাবে কেনই বা স্কুলে চালাবার অনুমতি দেন? এসব রীতিমত অনুসন্ধানের ব্যাপার।

উল্লেখিত বইগুলির প্রত্যেকটিই "পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত নতুন পাঠ্যসূচী অনুসারে" লিখিত এবং বেশীর ভাগই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য। তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর বইও আছে, তবে সেগুলি ক্বচিৎ ভূগোল-বিজ্ঞান-ইতিহাসের। বেশীর ভাগই হয় প্রশ্নোত্তরে সাধারণ জ্ঞান, নয় স্বাস্থ্য খেলাধূলা-কর্মশিক্ষা অথবা সর্বশাস্ত্রের নোট 'ছাত্রবন্ধু'।

কেন দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যই বা এত বই-এর ছড়াছড়ি? খোঁজ নিতে জানা গেল দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সরকার প্রকাশিত কোন বই নেই। তাহ'লে 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যসূচী' এলো কোত্থেকে? প্রাথমিক শিক্ষকদের কেউ বা বললেন,—সিলেবাস? না, তেমন তো আলাদা করে কিছু আছে বলে জানি না। সরকারী বইগুলোই সিলেবাস।

একজন শিক্ষিকার মনে পড়ল—ট্রেনিং-এর সময় ঐ রকম একটা বই দিয়েছিল বটে! তাঁর কাছ থেকে এভাবেই পাওয়া গেল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত "প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী 1979" (প)।

বইটা পড়ে রহস্যোদ্ধার হল খানিকটা। পরিবেশকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রাকৃতিক (ভূগোল) এবং সামাজিক (ইতিহাস)। আর একটি অংশকে পৃথকভাবে বলা হয়েছে প্রকৃতিবিজ্ঞান, এবং এই তিনে মিলেই প্রাথমিক স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষা ধরা যায়। সামগ্রিক ভাবে একেই বলা হয়েছে পরিবেশ-পরিচিতি। "প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সংযুক্ত এবং ধারাবাহিক পাঠ্যসূচী"ও একটি নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু "প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের জন্য কোন পাঠ্য বই থাকছে না। শিক্ষকের উপস্থাপনার উপরই বিষয়টির সার্থকতা নির্ভর করবে। বিষয়টিকে সম্যক অনুধাবনের জন্য শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত ভাবে 'শিক্ষণ ব্যবহারিকা'য় উপস্থাপন করতে হবে। উহাতে পাঠোপকরণ প্রভৃতি বিষয়েও নির্দেশ থাকবে" (প, 67)।

"শিক্ষণ ব্যবহারিকাও" একটি সত্যিই ছিল বা আছে, তবে অধিকাংশ শিক্ষক তার খোঁজ রাখেন না, "পাঠ্যসূচী"তে উল্লিখিত পরিবেশ-পরিচিতির যে বিস্তৃত পাঠ্যসূচী (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সংযুক্ত ও ধারাবাহিক) দেওয়া আছে—"ব্যবহারিকা"য় তার চেয়ে বেশী তেমন কিছু নেই বলে জানালেন একজন প্রধান শিক্ষক। অতএব স্কুল তথা শিক্ষকরা সহজ পথ নিয়েছেন—প্রকাশকদের এগিয়ে দেওয়া এসব বই। অভিভাবকরাও নাকি এতে খুশী। সরকার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত বহু স্কুলেও এসব বই অবাধে চলছে। প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয়ে 'পাঠ্যসূচীর' নির্দেশ: "প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। মামুলী পাঠও দেওয়া হবে না" (প, 75)।

অর্থাৎ, ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ-পরিচিতি-তে প্রকৃতিবিজ্ঞান থাকবে না এবং সাধারণভাবে প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানকে সম্পৃক্ত ভাবে শিশুদের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে এই ছিল সরকারী নীতি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বই না রাখার যুক্তি হিসেবে, একজন শিক্ষক জানালেন, গ্রাম-শহরে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, কোন একটি মাত্র বই রাজ্যের সমস্ত শিশুর বাস্তব পরিবেশ তুলে ধরতে পারে না। নিঃসন্দেহে পরিকল্পনা অত্যন্ত সাধু। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক চান অবলম্বন, অতএব দ্বিতীয় (ও প্রথম?) শ্রেণীর জন্য বেসরকারী বই-এর রমরমা বাজার!

পাঠ্যসূচী রচনার নির্দেশিকায় বলা ছিল, "জাতীয় সংহতি বিঘ্নকারী এবং ভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী কোন ধারণা যেন পাঠ্যসূচীতে সন্নিবেশিত না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।" এবং "কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে দ্বিবিভাগ (dichotomy) দূর করার জন্য প্রয়াস পেতে হবে" (প, 83)। অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য এ সব নীতি যে ভীষণ ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা জোর দিয়েই বলা যায়।

পাঁচ॥ উপরের শ্রেণীর বই-এর বাজার সংকুচিত, কিন্তু···

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন? এই তিন শ্রেণীর জন্যই সরকারী পাঠ্যপুস্তক আছে। একটিতে ইতিহাস-ভূগোল, অন্যটিতে প্রকৃতিবিজ্ঞান থাকার কথা। স্বীকার করতেই হয় যে অন্তত বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার দিক থেকে সেগুলি অনেক ভালো। কিন্তু সেগুলিও ত্রুটিমুক্ত নয়।

সময়মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরকারী বই না পাওয়ার অভিযোগ প্রায় সমস্ত স্কুলের এবং সেই ফাঁক দিয়ে কিছু বেসরকারী বই গলে যায়। তা ছাড়াও, সরকারী বইও আশানুরূপ নয় : চিত্র ও ছাপা অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট ও ধ্যাবড়া, অক্ষর ভাঙা বা উধাও। এখানেও চিত্রে ছেলের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী। তৃতীয় শ্রেণীর প্রকৃতিবিজ্ঞানে (ফ) প্রায় 50 টি মানুষের অবয়বের পাঁচটিতে মেয়ের আদল, চতুর্থ শ্রেণীর প্রকৃতিবিজ্ঞানে (ব) 18টিতে 2টি। এমনকি মামুলি কিছু পরীক্ষা করা হ'চ্ছে এমন চিত্রেও কোন মেয়ের উপস্থিতি নেই।

সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনার নীতিও সরকারী বইগুলিতে সর্বদা রক্ষিত হয়নি। অথবা নীতিগুলিই ঝাপসা হয়ে গেছে : প্রকৃতি-বিজ্ঞান তো প্রথম থেকেই পরিবেশ পরিচিতির অংশ বলে গণ্য হয়নি। তৃতীয় শ্রেণীর "সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ : ইতিহাস ও ভূগোল, প্রথম ভাগ" (ভ) চতুর্থ শ্রেণীতে 'দ্বিতীয় ভাগ' হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে আর 'সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ' কথাগুলি নেই, সরাসরি 'ইতিহাস ও ভূগোল' হয়ে গেছে, একই মলাটের তলায় দুটো পৃথক বই হিসেবেই এসেছে (ম)। পঞ্চম শ্রেণীতে ইতিহাস ও ভূগোল একে-বারেই পৃথক হয়ে গেছে। তাও আবার ইতিহাসটি (য) 1966-তে প্রকাশিত পুরনো বই, নতুন পাঠ্যসূচীর সঙ্গে কোন মিল নেই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনেই ধাক্কা খেতে বাধ্য। পুরনো বইটির শৈলী এবং দৃষ্টিভঙ্গী তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীতে যে নতুন শৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসৃত হয়েছে, তার সঙ্গে বেমানান, কিন্তু সেটিই চলছে। আর নতুন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত পৃথক 'ভূগোল' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 1985-তে (র)।

আমাদের শিশুরা কি পরিমাণ অযত্ন-অবহেলা-তাচ্ছিল্যের শিকার—বইগুলি তারই দর্পণ!

পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র বা শেষ কথা নয়। অর্থ ও সরঞ্জামের চেয়ে বোধ হয় বেশী অভাব আমাদের নিজেদের ইচ্ছা, উদ্যোগ, উদ্যম ও সৃজনশীলতার···।

চতুর্থ শ্রেণীর প্রকৃতিবিজ্ঞানে (ব) যেখানে বিদ্যুৎশক্তির উৎসগুলির নাম পর্যন্ত করা হয়নি, সেখানে ঐ একই শ্রেণীর ভূগোল পাঠ্যাংশে তাপ ও জলবিদ্যুতের সঙ্গে পরমাণু বিদ্যুতের কথাও বলা হয়েছে এবং গর্বের সঙ্গে জানানো হয়েছে, "ভারতে পরমাণু শক্তি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রও তৈরী হয়েছে"। সঙ্গে একটি "ডোম" যুক্ত জ্যাবড়া চিত্র। নীচে পরিচয়, "পারমাণবিক কেন্দ্র" (ম, 17-18)! পঞ্চম শ্রেণীর "ভূগোলে" অনুরূপভাবে দেখা যায় মহাকাশযাত্রার উদাহরণ দিয়ে জন্মভূমির জন্য গর্ব জাগানোর প্রয়াস— "তোমরা নিশ্চয়ই কবিতার এই কটি লাইনের সঙ্গে পরিচিত : 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কি মহা হর্ষ।'···

এই একই ভাব প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রথম নভোচারী শ্রী রাকেশ শর্মা··· 'ভারত মাতার মাথায় তুষার ঢাকা হিমালয়···।' এই দেশে জন্ম গ্রহণ করেছি বলে প্রত্যেকে গর্ব অনুভব করতে পারি (র, 7)। একে তো দ্বিজেন্দ্রলালের এত সুপরিচিত কবিতার উদ্ধৃতিটুকুতেও ভুল, তায় আবার মাটি ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া, এও কম গর্বের ব্যাপার কি?

শিশুমনে অন্ধবিশ্বাস ও বৈষম্যের ভিত্তি দৃঢ় হবার অবকাশ আছে তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যাংশে : "তখন কিছু কিছু লোক ঝাড়ফুঁক, তুকতাক শুরু করল। এদের মধ্যে পুরোহিতরাও ছিলেন। কখনও কখনও এতে হয়তো ভালো কাজ হতো" (ভ,36)। আবার, "নানা কাজে শক্তি সাহস দেখিয়ে ক্রমশ পুরুষরা এগিয়ে এল। তাই ক্রমশ পুরুষই হ'ল গোষ্ঠীর নেতা, যাই হোক ধীরে ধীরে সুন্দর নিয়ম মানা একটা সমাজ গড়ে উঠল" (ভ, 32)।

ঐতিহাসিক ভাবেও এ ধরনের বিবৃতি ভগ্নসত্য মাত্র এবং তারচেয়েও মজার কথা, "পাঠ্যসূচী" তে তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসের যে বিস্তৃত 'নমুনা খসড়া' দেওয়া হয়েছিল, 'পাঠ্য পুস্তক রচয়িতার জন্য নির্দেশিকা' হিসেবে, তাতে কিন্তু উপরি-উক্ত দুটি ধারণার (ঝাড়ফুঁকে ভাল কাজও হয় এবং শক্তি সাহস পুরুষেরই ব্যাপার) ইঙ্গিত মাত্রও ছিল না! (প, 106, 111)।

"গরম কিছুর ওপর থেকে যে ধোঁয়া ওঠে তাকেই বাষ্প" বলে (ভ, 49)—এই ধরনের আলগা সংজ্ঞা বই-এর শ্রী বা শিশুদের জ্ঞান বাড়াবার সহায়ক হতে পারে কি?

বেসরকারী অনেক স্কুলেও তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণীতে সরকারী বইও পড়ানো হয়। এই তিন শ্রেণীর জন্য অন্তত, বোঝা যাচ্ছে, বেসরকারী বই-এর বাজার তেমন ভালো নয় এবং সেরকম বইও কম, তবে যা আছে তাও কম দূষণ ছড়াচ্ছে না।

উদাহরণ হিসেবে, "তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকারী গৃহপাঠ্য পুস্তক" 'ছাত্রবন্ধু'র (ল) উল্লেখ করা যায়। অপেক্ষাকৃত দামী, সব বিষয়ের এই নোট বইটি এমনিতেই সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। তার উপর আবার পাঠ্য বই-এর বিষয়গুলির সারাংশে কোথাও কোথাও ঘটেছে অবাঞ্ছিত বিকৃতি ও ভ্রান্তি : তৃতীয় শ্রেণীর বইতে ইতিহাস অংশে আদিম মানুষের চেহারা "বনমানুষের মত" বলে বর্ণিত হয়েছে (ভ, 9)। ঐ শিশুই হয়তো দ্বিতীয় শ্রেণীতে বেসরকারী কোন বইতে পড়ে এসেছে "শিম্পাঞ্জীর মত"। শিশুর বিভ্রান্তি অনুমেয়। কিন্তু না। বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ছাত্রবন্ধু—"···আকৃতির দিক থেকে আমাদের এই পূর্ব-পুরুষদের শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটাং, গরিলা প্রভৃতির সঙ্গে মিল ছিল অনেক বেশী" (ল, 9)! অন্যত্র, "বন্য পশুর···তুলনায়, দুর্বল ও খর্বাকৃতি মানুষ ···আজ লাভ করেছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীর মর্যাদা।···বহু অতিকায় পশু তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারে নি। এর কারণ অন্যান্য প্রাণীদের

তুলনায় মানুষের বুদ্ধি অনেক বেশী এবং মানুষের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য" (ল, 16)। পাঠ্য বইতে (ভ), কিংবা পাঠ্য সূচীতে (প) এ ধরনের কিছু নেই। হয়তো থাকা উচিত মনে হয়নি, কারণ বুদ্ধি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যও বিকশিত হয়েছে এবং সেই বিকাশের জটিলতা শিশু পাঠ্যে পরিহার্য গণ্য হয়েছে। তাতে কি হয়েছে, তারা তো আর ছাত্র-বন্ধু নয়!

তবুও 'ছাত্রবন্ধু' সহ বহু বাড়তি বই ছাত্রছাত্রীদের কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে; অনেক ক্ষেত্রে স্কুল থেকেই বিক্রীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বুকলিষ্টেও বাড়তি বই-এর নাম দেওয়া হচ্ছে, কোথাও বা উল্লেখ থাকছে "গৃহপাঠ্য" বলে। স্কুলের রুটিনে ক্লাশ থাকে, কিন্তু ক্লাশ না নিলেও চলে, এমনি ব্যাপার আর কি!

ছয়॥ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও ব্যবস্থা

আমেরিকা প্রবাসী এক বাঙালী ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন বিদেশে। ছেলেমেয়ে দু'টির স্কুল যাবার সময় হয়েছে। তাদের কথা ভেবে দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে ভাবগতিক দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। ভীতির কারণটা তাঁর জবানীতেই শোনা যাক—তোমাদের এখানে প্রাথমিক স্কুলে যেরকম পড়াশোনার চাপ দেখছি তাতে আমার ফিরে আসার ইচ্ছা বোধহয় ত্যাগ করতে হবে। আমি আমেরিকাতে দেখছি, ইংলণ্ডেও একটু দেখেছি, বাচ্চাদের উপর পড়াশোনার চাপ বলে কিছু প্রায় নেই। স্কুল ছাড়া বাড়ীতে পড়ার ব্যবস্থাই রাখা হয় না। স্কুলে খেলাধূলা, পড়াশোনা, নাচগান ও অন্য নানা ক্রিয়াকলাপে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে যৌথভাবে এমনভাবে তারা অংশগ্রহণ করে যে বাচ্চাদের শিক্ষাটা হয়ে ওঠে সহজ, সাবলীল ও বাস্তবঘেঁষা। সাধারণত স্কুলগুলির সঙ্গেই থাকে লাইব্রেরী, খেলার পার্ক এবং প্রদর্শনী হলঘর; কোথাও কোথাও সংলগ্ন শিশু-স্বাস্থ্যকেন্দ্রও। এই হলঘরগুলি বড় মজার। প্রশস্ত হলঘরে সাজানো থাকে শিশুদের উপযোগী এবং হয়তো শিশুদেরই আঁকা, নানারম ছবি মডেল চার্ট; তাদের নাগালের মধ্যেই সাজিয়ে ডিসপ্লে করা থাকে আকর্ষণীয় রঙীন সব বইপত্র। দেশ-বিদেশের বিচিত্র পোষাকের মানুষ এবং জীবজন্তু, গাছপালা-পাহাড়-নদী যেন বইগুলির পাতা-মলাট থেকে শিশুদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। শিশুদের অবাধ সুযোগ থাকে আপন মনে ঘুরবার, খেলবার, পড়বার। ক্লাশগুলিতে বিষয় পড়ানো বই হাতে করে হয় না। গল্প, ছবি ও কাজের মাধ্যমেই বেশী হয়। এখানে তো দেখছি স্কুলে যেমন পড়াশোনার চাপ, বইগুলো তেমনি নীরস তথ্যে বোঝাই; মোটেই আকর্ষণীয় নয় তাদের ছবি-ছাপা। তার উপর আবার বাড়ীতে তো দেখছি প্রাইভেট টিউটর রাখার হিড়িক। তা সত্ত্বেও আমি বলতে পারি না এখানে স্কুলশিক্ষা ওখানকার চেয়ে ভালো বা কার্যকরী। এমনকি বাংলাদেশ পর্যন্ত এ ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি করেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

ভদ্রলোকের কথায় আমি তখন খুশী হতে পারিনি; বলেছিলাম আপনিও তো এখানেই পড়াশুনা করেছেন। তাছাড়া আমরা গরীব, টাকাপয়সা জায়গার অভাব আমাদের নিত্যসঙ্গী। মনে মনে বলেছিলাম, —আপনাদের মত লোকদের কথায় কথায় ইংলণ্ড আমেরিকা টেনে আনা একটা রোগবিশেষ। শিশুদের জন্য ব্যবস্থা কত ভালো হতে পারে, তা যদি বলতেই হয় তো সমাজতান্ত্রিক কোন দেশের ব্যবস্থার কথা বলাই ভালো।

কিন্তু ভদ্রলোকের কথাগুলি আমার নতুন করে মনে পড়ল যখন দেখলাম "শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী"তেই অন্যতম একটি নির্দেশ—"পাঠ্যসূচী যাতে কোনক্রমেই নিষ্ক্রিয় তথ্যে ভারাক্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে" (প, 83)। শুধু তাই নয়, আরও নির্দেশ ছিল—"ভাষা, গণিত ও পরিবেশ-পরিচিতির পাঠ্য বিষয় প্রধানত বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে যাতে সম্পন্ন হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠ্যসূচী রচনা করতে হবে" (প, 84)।

পাঠক্রমে চারটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছিল: খেলাধূলা ও শরীরচর্চা, উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ এবং পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ। এবং সময়ের হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সপ্তাহে 17 ঘণ্টা স্কুল-সময়ের শতকরা 55 ভাগ নির্দিষ্ট হয়েছিল পঠন-পাঠনের বাইরের তিনটি ক্ষেত্রের জন্য। আর তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে এর জন্য সাপ্তাহিক 22 ঘণ্টার প্রায় অর্ধেক নির্দিষ্ট হয়েছিল (প, 8)।

বাস্তব অবস্থাটা কেমন? প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাপ্তাহিক গড় স্কুল-সময় 14 15 ঘণ্টা। তার মধ্যে 1-2 ঘণ্টা টিফিন, 2-3 ঘণ্টা পঠনপাঠনের বাইরে খেলাধূলা কর্মশিক্ষা ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু শিক্ষকের অভাব, স্থানাভাব ইত্যাদি কারণে তা বহুক্ষেত্রেই পালিত হয় না। তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীর জন্য সাপ্তাহিক স্কুল সময় 15-20 ঘণ্টা। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মেয়েদের একটি প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর রুটিন সময় 19 ঘণ্টা, টিফিন 2 ঘণ্টা, খেলাধূলা কর্মশিক্ষা ইত্যাদির সময় 3 ঘণ্টা (সেলাই 1 ঘণ্টা, খেলা 1 ঘণ্টা, অঙ্কন ও হাতের কাজ আধ ঘণ্টা করে)। কলকাতার নামী সরকারী একটি স্কুলে (ছেলেদের) চতুর্থ শ্রেণীর রুটিন সময় 18 ঘণ্টা, টিফিন 1 ঘণ্টা, খেলাধূলা ইত্যাদি 5 ঘণ্টা (অঙ্কন, আবৃত্তি, হাতের কাজ, হাতের লেখা, গান—সব মিলিয়ে প্রায় 3 ঘণ্টা, পি টি ও খেলা প্রায় 2 ঘণ্টা)। বলা যায়, সর্বোত্তম অবস্থা যা বিরল। পঠনপাঠনের বাইরের নির্দিষ্ট তিন ক্ষেত্রের চর্চার জন্য সময় এত কমের কথা তুললে শিক্ষকরা টাকাপয়সা, জায়গা, এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথার সঙ্গে আর যা বলেন, তাও সত্যি। অভিভাবক-দের একটা বড় অংশই চাননা স্কুলে খেলাধূলা ইত্যাদির পেছনে সময় 'নষ্ট' হোক বরং তাঁরা আরও বিষয় আরও বই পড়ানোর জন্যই চাপ দেন!

এমনিতেই এ রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলো পর্যন্ত শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়েছে, বিশেষত শহরাঞ্চলে, স্কুলে স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে। তার উপর সেগুলি ছেলেমেয়েদের জন্যও পৃথক হয়ে গেছে। বৈষম্য নিয়েই তাদের যাত্রা শুরু। খারাপ পাঠ্যপুস্তক আর কতটা ক্ষতি করবে? এ প্রশ্নও অনেকে তুলতেই পারেন।

প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানশিক্ষা—একটি ভবিষ্যৎ ইমারতের ভিত্তি : অথচ অবিশ্বাস্য রকম নড়বড়ে। দীর্ঘ-অবহেলিত এই জগৎটিকে নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা খুব জরুরী।

বিজ্ঞানশিক্ষা : প্রাথমিক হালচাল

রবীন মজুমদার

ভূমিকা :

বন্ধুপুত্র অরিন্দম একটি বেসরকারী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। অনেক দৌড়ঝাঁপ কসরৎ করে বন্ধুবর ছেলেকে নামী স্কুলটায় ভর্তি করতে পেরেছিল। ইংরেজীর উপর জোর থাকলেও, বাংলাও নাকি স্কুলটাতে ভালোই পড়ানো হয় এবং অন্যান্য বিষয় বাংলাতেই পড়ানো হয়।

কিছুদিন আগে ওদের বাড়ীতে গিয়ে অরিন্দমের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর ইতিহাস বইটা নাড়াচাড়া করছিলাম। হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল। চমকে উঠে, চোখ কচলে ভাল করে পড়লাম। না, স্পষ্টই লেখা আছে—"বর্তমানে সাঁওতাল কোল ভীল মুণ্ডা ভুটিয়া ও নাগা প্রভৃতি জাতিরা আদিম অধিবাসীদের বংশধর বলে মনে হয়।" অরিন্দমদের একটা ভূগোল-বিজ্ঞান-স্বাস্থ্য-সমাজ শিক্ষার বইও আছে শুনে, সে বইটাও আমি একটু দেখতে চাইলাম। বইটা আগাগোড়া প্রশ্নোত্তরে। কিছু কিছু প্রশ্ন ও উত্তর সত্যিই চমকপ্রদ :

সমাজ কাকে বলে?—গ্রামে একসঙ্গে অনেক লোক মিলেমিশে থাকার নাম সমাজ।

"পৃথিবীর খুব নিকটের গ্রহ কোনটি?—মঙ্গল"
"সর্বাপেক্ষা ছোট গ্রহের নাম মঙ্গল"
"দুধ চাল গম প্রভৃতি লবণ জাতীয় খাদ্য"
"আমরা কারা? —আমরা বাঙালী"

অসার, বিকৃত ও ভুল তত্ত্ব তথ্য এবং অসতর্কতা ছাড়াও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ও সামাজিক বৈষম্য এবং কোথাও কোথাও যুদ্ধবাজ মনোভাব স্পষ্ট। বেশীর ভাগ বইতেই ছেলের ছবি মেয়ের ছবির তুলনায় অনেক বেশী।

পৃথিবীর খুব নিকটের গ্রহ কোনটি?—মঙ্গল।

সাঁওতালী কাদের বলা হয়?—বিহারের সাঁওতাল পরগণার লোকদের সাঁওতালী বলা হয়।

উড়িয়াদের বেশ কিরূপ?—উড়িয়াদের কপালে চন্দন মাথায় টিকি এবং গায়ে চাদর থাকে।—ইত্যাদি।

ইতিহাস আর ভূগোল-বিজ্ঞানের এই দুটো বই মিলিয়ে অরিন্দমদের পরিবেশ-পরিচিতির কোর্স।

দুই ।। শিশুপাঠ্যে বিজ্ঞান-স্বাস্থ্য-সমাজ ও ইতিহাস

কৌতূহলবশতই বাজারে চালু কয়েকটি বই জোগাড় করে পড়া গেল। বেশ মজাও যেমন পাওয়া গেল, দুঃখও হতে লাগল। ছোটদের এইসব পাঠ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বই থেকে অনেক নতুন তত্ত্ব-তথ্যের হদিস পাওয়া গেল। তারই কিছু নমুনা : (প্রবন্ধের শেষে দেওয়া উল্লেখতালিকা অনুযায়ী কোন্ বই থেকে নেওয়া তা ক, খ···ইত্যাদি অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হ'ল। কোথাও কোথাও পৃষ্ঠাসংখ্যাও একই সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। অরিন্দমের বই দুটিও তালিকায় আছে।)

"সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে 24 ঘন্টা" (ক, খ, ঠ)।

"যে উদ্ভিদ লতিয়ে চলে তাকে লতা বলে" (গ)।

"কাঁকুরে মাটিতে ধান ও সরষে ভাল জন্মে" (গ, ঘ)।

"ডুমুর ও বট গাছের ফুল নেই ফল আছে" (ঙ, চ)।

"পৃথিবীর বাইরে সীমাহীন মহাশূন্যতার নাম আকাশ" (ঙ)।

"সর্বাপেক্ষা ছোট গ্রহ মঙ্গল" (ঙ)।

"পরিষ্কার বালি সোডা ছাই ও খাড় মাত্রা অনুযায়ী মিশাইয়া উত্তাপে গলাইয়া কাঁচ প্রস্তুত হয়" (ঙ)।

"পচা স্যাঁৎসেঁতে জায়গা হইতে ফসফরাস নামক এক রকমের গ্যাস বাহির হয়। এই গ্যাস রাত্রে কোন কারণে জ্বলিলে তাহাকে আলেয়া বলে" (ঙ)। "রূপোয় গন্ধক লাগিলে কালো হয়। বাতাসে গন্ধক আছে, গায়ের ঘামেও গন্ধক আছে। এইজন্য রূপো বাহিরে থাকিলে বা বেশীদিন ব্যবহার করিলে কালো হইয়া যায়" (ঙ)। "খাল বিল প্রভৃতি জলাশয়ের কাদা বছরে বছরে স্তরে স্তরে শুকাইয়া শ্লেট হয়" (ঙ)। "খনি হইতে তুলিলে সোনা তরল অবস্থায় থাকে" (ঙ)। বিলক্ষণ বোঝা গেল, "বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান" বলে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর নমুনারও স্বাদ নেওয়া যাক :

"স্বাস্থ্য কথাটির অর্থ শরীর নীরোগ থাকা" (গ)।

"দূষিত জলে কলেরা, টাইফয়েড ও যক্ষ্মা রোগের জীবাণু থাকে।" পেটের অসুখ—"বড় পাজী রোগ। পাতলা পায়খানা হয়ে দেহটাকে কাহিল করে···" (ছ, জ)। "প্রত্যহ স্নানের সময় কানে সরিষার তেল দিতে হয়। ইহাতে ময়লা বা খইল জমে না। কানে খইল জমলে পালক বা কান-খুচানী দিয়ে কান পরিষ্কার করবে" (ঝ)। "ঘুমে শরীর ও মনের বিশ্রাম হয়। ঘুমের মধ্যেই শরীরের ক্লান্তি দূর হয়, খাবার হজম হয় এবং নূতন রক্ত ও মাংস তৈরী হয়" (ঘ)। "ভিটামিন ও প্রোটিন যুক্ত

খাবার খাওয়া উচিত। যেমন, দুধ, মাছ, মাংস, ঘি প্রভৃতি" (ক)। "কলেরা রোগের প্রতিকার" হিসেবে বলা আছে, "কলেরার সময় অন্য সুস্থ লোকের খুব সাবধানে থাকা ও খাওয়া উচিত। বাসি বা পচা খাবার খেতে নাই। খালি পেটে থাকাও উচিত নয়। কলেরার ইনজেকশন ও টীকা নেওয়া উচিত" (ঝ)। "দুধ, চাল গম প্রভৃতি লবণ জাতীয় খাদ্য" (ঝ)। "যে শিরা দিয়ে দেহের নানা স্থান থেকে রক্ত হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে শিরা বলে। যে নাড়ী দিয়ে হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত দেহের নানা স্থানে চলে যায় তাকে ধমনী বলে" (গ)। কোন কোন বইতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে—"স্বাস্থ্য কি টাকা দিয়ে কেনা যায়?" এবং উত্তরে বলা হয়েছে—"না··· স্বাস্থ্য রক্ষার সকল নিয়ম মেনে চলতে হবে" (ছ, জ)—তাতে শিশুদের সম্যক প্রতীতি কি এরপরও না হয়ে পারে?

গ্রাম-শহর-সমাজের কি নিখুঁত ছবিই না ফুটে উঠেছে বইগুলিতে: "আমরা কারা?—আমরা বাঙালী" (গ)। গ্রামের লোকেরা "খুব সরল; মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে তারা সন্তুষ্ট থাকে" (ঘ)। "গ্রামের পথ-ঘাট কাঁচা। ···আজকাল জাতীয় সরকারের চেষ্টায় অনেক গ্রামে পাকা রাস্তা হয়েছে" (ঘ)। "শহরে সাইকেল, সাইকেল-রিক্সা, বাস, লরী, মোটর, গরুর গাড়ী, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি যানবাহন দেখা যায়। বড় বড় শহরে রিক্সা ও ট্রামগাড়ী দেখা যায়" (ঘ)। "শহরের জীবনযাত্রা···খুবই সহজ ও আরামদায়ক" (গ)। "প্রতিটি গ্রামে একটি করে গ্রাম-পঞ্চায়েত থাকে, যা গ্রামবাসীর সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর রাখে" (চ)। "পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়েছে অঞ্চল, এখন অঞ্চলের নাম হয়েছে অঞ্চল-পঞ্চায়েত" (ঞ, ট)। "···অঞ্চল সমিতির নাম অঞ্চল-পঞ্চায়েত" (ঠ)। "কয়েকটি গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে হয় এক একটি থানা" (ঘ)। "শহরে টিনের, টালির বা অ্যাসবেসটসের বাড়ীগুলি গায়ে গায়ে লাগান থাকে। এখানে আলো, বাতাস থাকে না। এগুলিকে বসতি বাড়ী বলে" (ঞ, ট)। "মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ভারতবর্ষের একজন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ, মেথর, হিন্দু-মুসলমান সবাই সমান। তাই তাঁর জন্মদিনকে আমরা পরিচ্ছন্ন দিবস বলে পালন করি" (ঞ, ট)। "পৃথিবীর শ্রমিকরা পয়লা মে দিনটিকে শ্রমিক বলে মনে করেন" (ঞ, ট)।

অতএব সন্দেহ কি যে, "আমাদের অনেকের বাড়ীতে পড়াশোনা করানোর মত লোক নেই। তাই নিয়মিত পড়াশোনা করানোর জন্য বিদ্যালয়ের দরকার" (ঞ, ট)।

ইতিহাসের বইগুলি শিশুদের রীতিমত ঐতিহাসিক করে তুলতে পারে:

"হাজার হাজার বছর আগে একটা বড় তারা সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সূর্যের সাথে তার সংঘর্ষ হয়। তখন সূর্য থেকে ন'টা অংশ ছিটকে বেরিয়ে আসে" (ড)।

"একদিন কোন কারণে একটা বড় তারা সূর্যের কাছ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। তার আকর্ষণে সূর্যের গা থেকে খানিকটা জ্বলন্ত গ্যাসের গোলা ছিটকে বেরিয়ে আসে। সূর্যের আকর্ষণে···সূর্যের কাছেই আকাশে সেটা ভাসতে থাকল। ভাসতে ভাসতে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। তাদের মধ্যে নয়টা বড় বড় খণ্ড হ'ল নয়টা গ্রহ। পৃথিবী হ'ল একটা গ্রহ" (ঢ)।

"তারপর একদিন পৃথিবীতে দেখা গেল বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং। এরা গাছে চড়ে থাকত। ফলমূল খেয়ে দিন কাটাত। এদের মধ্যে একদল প্রাণী হঠাৎ একদিন মাটিতে নেমে এল। দুপায়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটতে লাগল। এরাই সম্ভবত বনমানুষ নামে পরিচিত" (ঢ)। সে সময়ের মানুষ—"দেখতে ছিল...কদাকার"··· "শিম্পাঞ্জীর মত, থপথপিয়ে হাঁটত" (ণ, ত, থ)। "বনের ফলমূল শেষ হ'লে, বনের পশু না পাওয়া গেলে কিভাবে বাঁচা যাবে এই চিন্তা হল মানুষের। তাই মানুষ গরু ভেড়া ছাগল এসব পশুদের পুষতে লাগল" (ণ, ত, থ)। "আদিম যুগের মানুষদের বলা হয় আদিবাসী" (দ)। "প্রথমে পৃথিবীর চারিদিকে শুধু জল আর জল ছিল, মাটি ছিল ফাঁকা" (ড)। "ডাঙ্গার জীবের পরই সৃষ্টি হ'ল ওড়া পাখির, তারপর পৃথিবীতে এল বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী। শিম্পাঞ্জীর পর বনমানুষ। বনমানুষের পর এল মানুষ" (ড)। "ভাবতে ভাবতে তারা···বনের নিরীহ পশুগুলিকে পুষতে আরম্ভ করল।···কুকুরই কিন্তু মানুষের প্রথম সাথী" (ড)। "বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোকেরা অপরকে খাটিয়ে নিজের সম্পত্তি বাড়াতে লাগল। বিনিময়ে সে তাকে দিতে লাগল খাদ্য ও অর্থ" (ঢ)। "বল্লাল সেনের সবচেয়ে বড় কাজ, বাঙালী সমাজে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি···" (ধ)।

তিন॥ যে অবহেলা অপরাধের সামিল·····

উদ্ধৃতিগুলির ভুলভ্রান্তি কোথায় কতখানি তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে গেলে বিস্তৃত পরিসর দরকার। কিন্তু একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও ঠিক হবে না।

প্রথমত, অনেক তথ্য সরাসরি ভুল। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে চব্বিশ ঘণ্টায় একপাক ঘুরে আসে—এমন তথ্য-সম্বলিত বই যে শিশুদের জন্য স্কুলে চলতে পারে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ যে শুক্র, সবচেয়ে ছোট গ্রহ যে বুধ, সাধারণ কাচ তৈরীতে যে বালি ও সোডিয়াম কার্বনেট ছাড়া চুনাপাথর লাগে, যা কোন মতেই ক্ষার নয়, ("খাড়" বলে কোন বস্তু জানা নেই), অঞ্চল আর অঞ্চল পঞ্চায়েত যে সমার্থক নয়, ফসফরাস নামের কোন গ্যাস নেই এবং আলেয়া যে মূলত জ্বলন্ত মার্স গ্যাস বা মিথেন—এসব নিয়ে বোধ হয় দ্বিমতের অবকাশ নেই।

কিছু কিছু তত্ত্ব-তথ্য হয়তো আংশিকভাবে ঠিক, কিন্তু এমন আলগা ভাবে অসতর্কতায় পরিবেশিত, যে ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিও ডেকে আনতে পারে। যেমন, কাঁকুরে মাটিতে ধান ও সরষে হ'তেই পারে, কিন্তু 'ভাল জন্মে' বললে ভুলই বলা হয়। তাছাড়া, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের কাছে বেলে, দোঁয়াশ ও এঁটেল ছাড়া অন্য প্রকার মাটির প্রসঙ্গ আনাটাই

"শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্য-বোধের বিকাশসাধন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনের এবং তদনুযায়ী নিজ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তিস্থাপন" (প, 5), প্রাথমিক শিক্ষার এই লক্ষ্যপূরণে আমাদের প্রয়াস সত্যিই কত সযত্ন, আন্তরিক ও মহৎ !

সাত ।। বিকল্পের সন্ধানে…

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে বই-এর ভুলত্রুটি নিয়ে এত কথা না বলে ভালো একটা বই লিখে ফেললেই তো হয় ! অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য তো সে পথ খোলাই আছে, আর সেখানেই সবচেয়ে বেশী দুরবস্থা ।

ভালো বই থাকলেও যে তা ভালো চলবে এমন কোন কথা নেই, সেটা তো দেখাই যাচ্ছে । কিন্তু তবুও, ধরা যাক, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পরিবেশ পরিচিতির একটি গাইড বই, সরকারী পাঠ্যসূচী অনুসারেই, কেমন হতে পারতো ? প্রথমেই মনে হয় প্রশ্নোত্তরের ফর্মটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক । এতে প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করায় যে দীক্ষা হয় তা-ই হয়তো পরবর্তী জীবনেও ছাত্রছাত্রীদের মেড ইজি বা প্রশ্নোত্তর খোঁজায় । প্রশ্নোত্তরে কার্যকারণ সম্পর্ক বা যুক্তি ও আন্তঃসম্পর্ক বোঝার চেষ্টা ব্যাহত হয় , লেখকেরও দায় থাকে না পারম্পর্য রেখে যুক্তিসিদ্ধভাবে কোন বিষয়কে উপস্থাপিত করার ।

বাংলার ঋতু ভিত্তিক ফুল, ফল, সব্জী-ফসলের রঙীন সচিত্র বর্ণনার একটা অ্যালবাম হ'তে পারতো আমাদের পরিবেশ পরিচিতির প্রথম ধাপ । শিক্ষক শিক্ষিকারা স্থানীয় বিজ্ঞান ক্লাব বা উৎসাহী ব্যক্তি-অভিভাবকদের সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারতেন আশেপাশে সেগুলিকে খুঁজে দেখতে, নমুনা সংগ্রহ করতে ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক বুঝতে । বর্তমান শিক্ষাক্রমে তার অবকাশ আছে ।

আর একটু উপরের স্তরে বর্তমান সরকারী পাঠ্যসূচী অনুসারেই সফল সক্ষম লেখক সাহিত্যিকদের লেখা থেকে সাজিয়ে সংযোজিত করে তৈরী হতে পারতো পাঠ্য বই । এরকম একটা প্রয়াস দেখাও যায় "কিশলয়" নামের ভাষা সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তকে । বিজ্ঞানেও এটি খুবই সম্ভব । প্রয়োজনে বিদেশী কিছু রচনার ভালো বাংলা অনুবাদও (তারও অভাব বর্তমানে নেই) ব্যবহার করা যায় । দরকার হবে সম্পাদনা ও কিছু সংযোজনা । …কিন্তু আবারও বলি পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র বা শেষ কথা নয় । অর্থ ও সরঞ্জামের চেয়ে বোধ হয় বেশী অভাব আমাদের নিজেদের ইচ্ছা, উদ্যোগ, উদ্যম ও সৃজনশীলতার ; অভাব সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়বার যৌথ সংকল্প ও প্রেরণার ।

উল্লেখতালিকা :

ক. ছোটদের প্রশ্নোত্তরে পরিবেশ পরিচিতি (দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূগোল-বিজ্ঞান-স্বাস্থ্য-সমাজশিক্ষা ও খেলাধূলা, 1987)—নিতাইচন্দ্র সাহা, রমা বুক এজেন্সি/শঙ্কর বুক স্টল, 1 বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-73.

খ. শিশুদের পরিবেশ পরিচয় (ঐ, 1987)—নিলয় বিশ্বাস, রমা বুক এজেন্সি/শঙ্কর বুক স্টল, ঠিকানা : পূর্বোক্ত ।

গ. প্রশ্নোত্তরে ভূ-বিবরণ ও স্বাস্থ্য সমাজশিক্ষা (দ্বিতীয় শ্রেণী, নতুন সংস্করণ, 1986)—হরেন্দ্রনাথ মিত্র, নির্মল বুক এজেন্সি, 89 মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-7.

ঘ. স্বদেশ ও পরিবেশ (দ্বিতীয় ভাগ) (দ্বিতীয় শ্রেণী, সংশোধিত সংস্করণ)—নবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ, বেলেঘাটা ভ্যারাইটি স্টোর্স, 134 রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কল-85.

ঙ. জানবো এবার জগৎটাকে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী, নতুন সং 1986) —অরুণলাল গোস্বামী, সানরাইজ পাবলিশার্স, 18 সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কল-9.

চ. কিশোর জ্ঞান বিচিত্রা (তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী, 1987)—বিকাশ কান্তি সাহা, রমা বুক এজেন্সি/শঙ্কর বুক স্টল, ঠিকানা : পূর্বোক্ত ।

ছ. স্বাস্থ্য-খেলাধূলা ও কর্মশিক্ষা (তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী, 1987)—অচ্যুত ব্যানার্জী ও সন্ধ্যা ব্যানার্জী, পি. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, 98 সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কল-9.

জ. আমাদের স্বাস্থ্য খেলাধূলা ও কর্মশিক্ষা (ঐ, 1986)—চিরঞ্জীব সেন, পি. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ঐ ।

ঝ. ছোটদের খেলাধূলা, স্বাস্থ্য সামাজিক ও কর্মশিক্ষা (তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী, নূতন সং 1987)—নিতাই মুখার্জী, রমা বুক এজেন্সি/ শঙ্কর বুক স্টল, ঠিকানা : পূর্বোক্ত ।

ঞ. পরিবেশের কথা (দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রথম সং, 1986), স্বরাজ চক্রবর্তী ও দিপালী ব্যানার্জি, পি. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, 18 সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কল-9.

ট. আমাদের পরিবেশ (দ্বিতীয় শ্রেণী, 7ম সংস্করণ 1985), সুধাংশু ভট্টাচার্য্য ও প্রতাপ নাগ, পি. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, 18 সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কল-9.

ঠ. পরিবেশ পরিচিতি (দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রথম প্রকাশ, 1982), প্রলয় ভদ্র, প্রতিভা প্রকাশনী, 11 ভবানী দত্ত লেন, কল-73.

ড. মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় শ্রেণী, 1987), সুনীল কুমার চক্রবর্তী, রমা বুক এজেন্সী/শঙ্কর বুক স্টল, ঠিকানা : পূর্বোক্ত ।

ঢ. মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় শ্রেণী, 1984), মানবেন্দ্র-নাথ রায়চৌধুরী, রমা বুক এজেন্সি/শঙ্কর বুক স্টল, ঠিকানা : পূর্বোক্ত ।

ণ. মানুষের ইতিহাস (দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রথম সং, 1986) নিশীথ রঞ্জন ঘোষ ও সবিতা পাঠক, সানরাইজ পাবলিশার্স, 18 সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কল-9.

ত. প্রশ্নোত্তরে মানব সভ্যতার ধারা (দ্বিতীয় শ্রেণী, নবম সং,

1985) কল্যাণ চৌধুরী, পি. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, 18 সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কল-9.

থ. গল্পে ও প্রশ্নে নতুন ইতিহাস (দ্বিতীয় শ্রেণী, 1984) ধীলন কুমার সরকার, সরস্বতী বুক এজেন্সী, 94 সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কল-9.

দ. প্রশ্নোত্তরে ইতিহাসের মণিমেলা (দ্বিতীয় শ্রেণী, নূতন সং, 1987) অসীমকৃষ্ণ মিত্র, নির্মল বুক এজেন্সী, 89 মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-7.

ধ. ছোটদের ইতিহাস (দ্বিতীয় শ্রেণী), অশোক গুহ, প্রগতি লাইব্রেরী, 8B টেমার লেন, কল-9.

ন. আমাদের ভূগোল (দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা), রতন চন্দ, সূচীপত্র, 35-C সূর্য সেন স্ট্রীট, কল-9.

প. প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী—প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার, পঃ বঃ সরকার (1979).

ফ. প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রথম ভাগ (তৃতীয় শ্রেণী, তৃতীয় সং, 1984), পঃ বঃ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার।

ব. প্রকৃতিবিজ্ঞান, দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্থ শ্রেণী, দ্বিতীয় সং, 1982), পঃ বঃ শিক্ষা অধিকার।

ভ. সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ : ইতিহাস ও ভূগোল, প্রথম ভাগ (তৃতীয় শ্রেণী, পঞ্চম সং, 1986), পঃ বঃ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার।

ম. ইতিহাস ও ভূগোল, দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্থ শ্রেণী, তৃতীয় সং, 1985), পঃ বঃ বিঃ শিঃ অঃ।

য. ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ (পঞ্চম শ্রেণী, প্রথম সং, 1966, পঞ্চদশ মুদ্রণ 1985) পঃ বঃ বিঃ শিঃ অঃ।

র. ভূগোল (পঞ্চম শ্রেণী, প্রথম মুদ্রণ, 1985), পঃ বঃ বিঃ শিঃ অঃ।

ল. ছাত্রবন্ধু : প্রথম ভাগ 1988 (তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যকারী গৃহপাঠ্য পুস্তক), ফণীভূষণ ঘোষ (অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী কর্তৃক পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও সংকলিত), প্রকাশক : বাণীকণ্ঠ রায়, 118 F নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কল-11. □

পড়ুন ও পড়ান

পরিবেশ (বুলেটিন-1)

(প্রকাশক : মন্দির বাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি, বিজয়গঞ্জ ; মুদ্রণ : 'সাধনা প্রেস', বিজয়গঞ্জ, দঃ 24-পরগণা)

মানসিক ব্যাধি

(জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা : চৌদ্দ)

ডাঃ লালমোহন ঘোষ

(নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন-এর অন্তর্গত 'জনস্বাস্থ্য প্রকাশন'-এর পক্ষে ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল কর্তৃক প্রকাশিত এবং বেঙ্গল জব প্রেস, 1/5/1 এ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-12 থেকে মুদ্রিত)

জনস্বাস্থ্য বনাম দূষিত উন্নয়ন

কেশোরাম রেয়ন এবং দক্ষিণ দমদম—সাম্প্রতিক দূষণ

দীপক ও শান্তনু ত্রিবেদী

('নিষঙ্গ', 6 ক্রিস্টোফার রোড, কলি-14 কর্তৃক প্রকাশিত)

জ্যোতিষ সম্মেলনে 'বিজ্ঞান চেতনা'

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে জ্যোতিষীদের একাদশ সম্মেলনে হাজির হয়েছিল 'বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়'-এর সদস্যরা। পেশ করেছিল সুস্পষ্ট কিছু প্রশ্ন। জবাবে পেল অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর কিছু বক্তব্য। একটি প্রতিবেদন।। সঙ্গে থাকছে 'বিজ্ঞান চেতনার পরিচিতি।

9-10 এপ্রিল, 1988 ছিল জ্যোতিষীদের একাদশতম সম্মেলন, এককালের বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। জ্যোতিষ বিজ্ঞানী (?)-রা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রচার করছিলেন তাঁরা আমাদের অর্থাৎ 'বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়'-এর বন্ধুদের জ্যোতিষ সম্পর্কে সমস্ত রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, 1985 সালে ওঁদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে (প্রেসিডেন্সির বেকার হলে) ওঁদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল,—তাতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম যার সদুত্তর আমরা তখন পাইনি। সে কারণে প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা যথারীতি এবারের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন গিয়ে হাজির হলাম বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সামনে—সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র বিরোধী পোস্টারও ছিল। সম্মেলনের প্রায় শেষের দিকে Open Session-এ আমাদের প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হ'ল।

আমাদের প্রশ্ন ছিল (1) গ্রহ নক্ষত্র আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায় কিভাবে? (2) 1984 সালে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় এক সঙ্গে প্রচুর লোক মারা যান—এ সমস্ত লোকের আয়ুরেখা কি একদিনে শেষ হয়েছিল? আর ওঁদের জন্মের সময় Stellar Constellation কি এক ছিল? (3) ওঁদের নিজেদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল রত্নরাজী নাকি "কসমিক রে" (মহাজাগতিক রশ্মি) ধারণ করার ভাণ্ডার। প্রশ্ন: কসমিক রে-এর মধ্যে কি কি আছে? রত্নরাজী কিভাবে এসব ধারণ করে? এটা কোন বৈজ্ঞানিকের তথ্য? (4) "মেটাল ট্যাবলেট" কি প্রক্রিয়ায় মানুষের উপকার করে?—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিন। (5) বাঁদরের হাত দেখে কি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন? (6) আমাদের কারুর হাত দেখে এক্ষুণি তার অতীত বলতে পারবেন কি? (7) ডঃ আব্রাহাম কভুরের জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর রাখা চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছেন না কেন?

প্রশ্নের লিষ্টি দেখে স্টেজে বসে থাকাবড় বড় জ্যোতিষী একে অপরের মুখ চাওয়াচায়ি করলেন বেশ কিছুক্ষণ। শেষে জানান হ'ল কোন সংগঠনের প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দেবেন না,—ব্যক্তির কাছ থেকে আসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন—জানি না এ দুটিতে প্রভেদ কি। স্পষ্ট বোঝা গেল প্রশ্নজাল এড়িয়ে যাচ্ছেন—তাই ব্যক্তিগত (অর্থাৎ কারও একজনের নামে) প্রশ্ন পাঠাতে হ'ল উত্তরদাতাদের কাছে,—বলা ভাল Open Session-এ জ্যোতিষ ভক্তরাও প্রশ্ন করছিলেন, এবং প্রায় সমস্ত জিজ্ঞাসু লোকদেরই কৌতূহল নিবৃত্ত করছিলেন এক বলশালী জ্যোতিষী,—বেঁটে, চশমা পরেন, হেলে দুলে সামান্য হেসে অনায়াসে উত্তর দেন।

একটা প্রশ্নের উত্তরে উনি মন্ত্র ও বিজ্ঞান-এর যোগ খুঁজতে গিয়ে বললেন, "বায়োকেমিষ্ট্রিতে বলে জীবকোষের একটা কম্পন আছে, এই মিলিত কম্পনে একটা আবেশ তৈরী হয় মানুষের চারপাশে,—আর বিজ্ঞানের ভাষায় এটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড"। এর পরেও কি চুপ করে থাকা যায়? আপনারাই বলুন। স্মরজিৎ বন্দোপাধ্যায়,—সাহা ইন্‌ষ্টিটিউটে গবেষণা করছে বায়োকেমিষ্ট্রিতে, তাই ফস্ করে বলে বসল, "এটা কোন্ তত্ত্বে আছে দাদা,—এত পড়লাম, পাইনি তো কোথাও। উত্তরের নামে আজে বাজে বকে সেই জ্যোতিষী অবশেষে বিজ্ঞানী Hoyle এর একটা সমীকরণ আওড়ালেন: "Intelligent being = Chemical Replication + bound electrical charges"; সমীকরণটা নাকি আমাদের প্রত্যেকের জেনে তারপর প্রশ্ন করা উচিত ছিল। এ যেন 2+3=5 সুতরাং 2 গরু+3 ছাগল=5 গাধা, এমন ধারা হিসেব। যা খুশী সমীকরণ যেখানে সেখানে লাগালেই হ'ল। অবশ্য বহু পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও ওঁরা Hoyle-এর বইটার নাম বলতে পারেন নি।

জ্যোতিষীদের নূতন আবিষ্কার: রত্নরাজী কসমিক রে ধারণ করার ভাণ্ডার। কসমিক রে সম্পর্কে ওঁদের সাবলীল বক্তৃতা শুনলে অবাক হ'তে হয়। স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল জাগে এই নূতন তথ্যটি কার? কোথায় পাওয়া যাবে এ সম্পর্কে সম্যক ব্যাখ্যা?—এতক্ষণ যিনি উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি বোধ হয় শুধু কসমিক রে সম্পর্কেই একটু কম জানেন—তাই এবার উত্তর দিতে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ এ. কে. ভট্টাচার্য,—বিনয়ের সুরে জানালেন কসমিক রে সংক্রান্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যই তাঁর লেখা "কসমিক থেরাপী" বইটিতে পাওয়া যাবে। সুতরাং ওটা নিয়ে এখানে বিশেষ কিছু বলবার দরকার নেই।

আশা করছিলাম উনি এবার বসবেন,—কিন্তু না, কম করে আধ ঘণ্টা উনি আমাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক বোঝালেন—কিছুক্ষণ চলল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে। কয়েকটা ভুল 'Differential Equation' কষলেন, তার মধ্যেই এল কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ওনার ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তবে পদার্থবিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রছাত্রীরাই জানবেন যে এতদিন ধরে তাঁরা যা শিখেছেন সব একেবারেই ভুল। ভদ্রলোক দেখছিলাম time dimension—এই শব্দটির সাথে পরিচিত। ওনার ধারণায় প্রাচীন ভারতেও Theory of Relativity-র উপর দাঁড়িয়ে Time-এর concept তৈরী হয়েছিল। আর আমরা সব আজকালকার ছাত্র যুবরা প্রাচীন ভারতের মূল্যবান জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করছি।

প্রায় একই ধরনের মন্তব্য ছিল আমাদের রাজ্যের সম্মানিত মন্ত্রী সরল দেবের। খবরের কাগজের মাধ্যমে উনি সকলের প্রতি আহ্বান রেখে-ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে আস্থা রাখুন, —এটা আমাদের ঐতিহ্য। ডঃ ভট্টাচার্য গর্বের সাথে জানালেন—"তোমরা জানতে চাও "কসমিক্ রে" কেন ভাল ? —VIBGYOR এর V (violet) ও R (Red) এবং এর মাঝের সব আলোই কসমিক্ রে। পুরাকালে ঘোড়ার দুটো লাগাম যাদের রশি বলা হোত সেখান থেকেই রশ্মি (রে) কথাটা এসেছে। লাগামের দুটি রশির একটা violet (বেগুনী) আর একটা হচ্ছে গিয়ে red (লাল) রশ্মি।" আমরা বিজ্ঞানের ছাত্ররা সত্যিই জানি না এমন সব চমৎকার তথ্য। —বাকি সব জ্যোতিষ-প্রেমীরা বোধ হয় মুগ্ধ হয়েই যাচ্ছিল ডঃ ভট্টাচার্যের কথায়। আমরা কসমিক রে সম্পর্কে যা জানি সেটা হ'ল : VIBGYOR এর কোনটাই "কসমিক রে" নয়।

ভদ্রলোকের দীর্ঘ বক্তব্যের পর অবশ্য আমাদের এক বন্ধু আর থাকতে না পেরে বলল, "মহাশয় আমরা চেয়েছিলাম এক গ্লাস জল, পেলাম আধ-খানা বেল। তা হোক ডঃ ভট্টাচার্য বলুন তো আপনি বিজ্ঞানী, না হাত দেখেন।" —এরপর ওঁনার দিকে আমরা আর তাকাতে পারি নি। সেদিন মজার খোরাক কম ছিল না আমাদের। বিংশ শতাব্দীতেও "পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে", এই তত্ত্বের প্রবর্তক এবং প্রচারক উপস্থিত ছিলেন সেখানে। খুব খুশী দেখাল তাঁকে, —আনন্দের চোটে ব'লে ফেললেন—"তিন বিজ্ঞানের সামনা সামনি লড়াই আজ : (এক) আমার প্রচারিত বিজ্ঞান, (দুই) 'বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়'-এর বন্ধুদের জানা সর্বজনগ্রাহ্য প্রচলিত আধুনিক বিজ্ঞান, (তিন) জ্যোতিষীদের প্রচারিত বিজ্ঞান।" উনি জোর দিয়েই বললেন একদিন ওঁর তৈরী বিজ্ঞানের সাথেই সকলে মিলবে। কিন্তু বিজ্ঞানী হবার ইচ্ছে সবারই বোধ হয় সেদিন ছিল প্রবল, তাই জ্যোতিষীদের একজন, (বাইরে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছি-লেন) ফিটফাট্ চেহারার, বাবুগোছের, বললেন—"কোনটাই ঠিক নয়—আমাদের পৃথিবী ও সূর্য দুটোই স্থির, কেউ নড়ছে না"। আমাদের এক বন্ধু ফিসফিসিয়ে বলে উঠল—দারুণ হয়েছে দাদা, আসলে আমরাই পাক খাচ্ছি।

উপরের কথপোকথন শুনলে হাসি পায় বড় জোর। কিন্তু এরা তো এই ব্যবসা চালিয়ে প্রচুর টাকাও কামাচ্ছে,—মানুষ আরও বেশী ভাগ্যনির্ভর হয়ে পড়ছে। এদিকে আমরা শুনছি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সমর্থক—কিন্তু অবাক না হয়ে পারা যায় না মন্ত্রী সরল দেবের সরলতা দেখে। হয়তো আজকাল মন্ত্রীরা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচারের সুযোগ কম পাচ্ছেন। কিন্তু তা বলে ঐ সম্মেলনে তাঁর উপস্থিত হওয়া বা ঐ ধরনের মন্তব্য করা কি উচিত ছিল ?

এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে—মানুষের বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা বাড়ছে দিনকে দিন। তাই জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত বোঝাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আছে ওঁদের। আমরা দেখেছি জ্যোতিষে বিশ্বাসী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক এমনকি ডাক্তাররাও। এতদিন তাঁরা যা শিখেছেন কিংবা ছাত্রদের যা পড়ান তার ঠিক উল্টো কাজ করেন নিজেদের ক্ষেত্রে। শরীর ও মনের রোগ সারাতে পাথর পরেন। ভবিষ্যৎ জানতে জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হন। এবারে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ জ্যোতিষীদের প্রচারে আরো একটু সাহায্য করলেন আর কি। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রভূমিতে বিজ্ঞানের নামে আবোল তাবোল তত্ত্ব বোঝান হল। হয়তো কোনদিন দেখব এই প্রতিষ্ঠানে মহাসমারোহে "হরিনাম সংকীর্তন" হচ্ছে—তাতে হয়তো বিজ্ঞানীদেরও দেখা যাবে। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সৌভাগ্য, তাঁকে এসব দেখে যেতে হয় নি।

বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয় (কলকাতা)

তরুণ বিজ্ঞানকর্মীর মৃত্যু

ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্দার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পি. মহান্তর পাঠানো একটি খবরে জানা গেল গুয়াহাটির কাছে বোকোতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় Muga Research Centre-এ গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এক তরুণ বিজ্ঞানকর্মী মুকুল গোস্বামীর দুঃখজনক মৃত্যু ঘটেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়ে গোস্বামী এই কেন্দ্রে মাত্র কয়েক মাস হলো কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় পিপেটের সাহায্যে বিষাক্ত কোনো রাসায়নিক নিয়ে কাজ করার সময় ঐ রাসায়নিক তাঁর মুখে চলে যায়। সে সময় গবেষণাগারে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না।

মুকুল গোস্বামীর এই মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। আমাদের রাসায়নিক গবেষণাগারগুলিতে নিরাপত্তার মাত্রা যে কত মারাত্মকভাবে কম তা আবার প্রমাণিত হল।

ঠিক কোন পরিস্থিতিতে কেন মুকুল গোস্বামীকে মৃত্যুবরণ করতে হল সে বিষয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্তদাবী করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের 'দুর্ঘটনা' এড়ানোর জন্য এ তদন্ত বিশেষ জরুরী।

সঃ মঃ বি-ও-বি।।

বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়

গণবিজ্ঞান কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির পরিচিতির এই কলমে গতবার ছিল মহারাষ্ট্রের লোকবিজ্ঞান সংগঠন এবং তাদের লোক-বিজ্ঞান ক্যালেণ্ডারের কথা। এবার থাকছে 'বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়'-এর পরিচয়। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এরাই জোতিষীদের সম্মেলনে রেখেছিল 'অস্বস্তি কর' প্রশ্নগুলি।

'বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়' সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে ওদের এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করি। অভিপ্রায় জানাতে ও খানিক ভূমিকা করে নিল। কিভাবে এই সংস্থা শুরু তাই নিয়ে। একটু আবেগ মিশিয়েই বলছিল। তাই ওর বয়ানেই রাখলাম ভূমিকাটুকু। তারপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তরের পালা।

ভূমিকা : বিজ্ঞান চেতনার বন্ধুর বয়ানে

তখন হিন্দু হোস্টেলে থাকি। কলকাতার বাইরে থেকে আসা আমরা বেশ কয়েকজন প্রেসিডেন্সিতে ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী বহু সংগঠনের লোকজনের (যাদের অধিকাংশই ছাত্র রাজনীতির সক্রিয় কর্মী) সাথে আলাপ পরিচয় হচ্ছিল। সকলেই সঠিক পথের দিশারী বলে দাবী করত। আমাদেরকেও তাদের রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য, তাদের হ'য়ে কাজ করার জন্য বলত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন-না-কোন দলে যোগও দিল। অনেকে দিল না। ক্লাসের বাইরে অবসর সময়ে কলেজ স্কোয়ারে আমরা ছ-সাতজন তখন চুটিয়ে আড্ডা মারি। হাল্কা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে গম্ভীর আলো-চনাও এসে পড়ে। সমাজ-দেশ-আমাদের অবস্থান-কর্তব্য-দলীয় রাজনীতি-রাজনৈতিক পথ-পরিবেশ দূষণ-কুসংস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন আলোচনা হয়। সকলেরই "একটা কিছু করতে হবে" এমন একটা ইচ্ছে বিভিন্ন কথাবার্তায় বেরিয়ে আসতে থাকে। অথচ যারা "কিছু করছে" বলে দাবী করে সে রকম কোন সংগঠন, নেতা, দাদা কারো সম্পর্কেই সে রকম আগ্রহ অনুভব করি না। ঐসব সংগঠনের মধ্যেকার ক্ষমতার লড়াই দেখে দেখে একটা কেমন হতাশা জাগতে থাকে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারি 'কিছু একটা করতে গেলে' সংগঠন প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আমাদের কারো কারো সাথে 'উৎস মানুষ' 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' ইত্যাদি পত্রিকার সাথে জড়িত কিছু ব্যক্তির বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ ঐসব পত্রিকার নিয়মিত পাঠকও হয়ে উঠেছি। যাই হোক বহুদিন ধরে নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনার পর আপাতত-একটা-বিজ্ঞান-ক্লাব-গড়ে-তোলা-যাক এরকম একটা চিন্তা মাথায় আসে। যে ক্লাব প্রধানত স্কুলের ছেলেদের সাথে একটা যোগাযোগ তৈরী করবে বিজ্ঞান পড়ানোর মাধ্যমে, আর সে বিজ্ঞান পড়ানো হবে বইয়ের ধরাবাঁধা ছকের বাইরে, অন্য রকম ভাবে। এসবই 1984 নভেম্বরের শেষের দিকের কথা। বিজ্ঞান ক্লাবের নাম রাখা হয় বিজ্ঞান চেতনা। তখন এ ক্লাবের সকল সদস্যই ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সর্বসাকুল্যে সদস্যও মাত্র আটজন। এখন আমাদের খুব সক্রিয় কর্মীই কুড়ি জন, মোট সদস্য পঞ্চাশেরও বেশী।

জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর

প্র : ঠিক কবে বিজ্ঞান চেতনার কাজ শুরু হয় ? কোথায় ?

উ : 1984-র 7ই ডিসেম্বর আমতার খোরোপ নামে গ্রামে আমাদেরই এক সদস্যের চেনাজানা স্কুলে নবম-দশম শ্রেণীর ছেলেদের বিজ্ঞান পড়ানোর মাধ্যমে কাজ শুরু হবে স্থির হয়। 1985-এর জানুয়ারী নাগাদ পড়ানোর কাজ আরম্ভ করি। হোস্টেলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পোস্টার-মডেল ইত্যাদি তৈরী করা হত। পনের দিন অন্তর যেতাম। প্রথম থেকেই চেষ্টা করতাম শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে বন্ধুর মত মিশতে, ওদেরকে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিতে, পড়াশুনোর বাইরে ওদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যা, ভাল লাগাগুলোকে জানতে বুঝতে।

ইতিমধ্যে '84র 3রা ডিসেম্বর ভূপালের মর্মান্তিক গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটে গেল—হাজার হাজার মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যু হল, গৃহহারা স্বজন-হারা হল অগণিত মানুষ। আমরা ভূপালের উপর পোস্টার সেট্ তৈরী করলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়াও আশপাশের চেনাজানা স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন জায়গায় এবং খোরপে সেগুলো দেখাতে লাগলাম।—এইভাবে কাজের পরিধি, চেনাজানার গণ্ডি ক্রমশ বড়তে লাগল।

প্র : এখনো কি খোরপের স্কুলে তোমরা পড়াও ? ঐসব ছাত্রবন্ধুদের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে কি ?

উ : না, মাস কয়েকের মধ্যে স্কুলের একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের কিছু শিক্ষক এইভাবে "বাইরের ছেলেদের" দিয়ে ক্লাস নেওয়ার বিরোধিতা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তাছাড়া বন্ধুর মত মেশার ফলে বহু ছাত্রই আমাদের কাছে স্কুলের কোন কোন শিক্ষকের পড়ানোর দুর্বলতা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু কথা বলে ফেলতে থাকে। এসবও কি করে যেন জানাজানি হয়ে যায়, ফলে আমাদের উপর কিছু শিক্ষকের অসন্তোষ তৈরী হয়। এসব কারণে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদেরকে সরে আসতে হল।

পুরনো ছাত্রবন্ধুদের সাথে কিছুদিন চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল, এখন অবশ্য সেটুকুও নেই।

প্র : এখনতো তোমরা বেশী পরিচিত ঐ "অলৌকিক নয় নিছক ম্যাজিক" অনুষ্ঠানটির জন্য। হঠাৎ তোমরা এ বিষয়টায় উৎসাহী হয়ে উঠলে কেন?

উ : গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র 1986-তে বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে বিজ্ঞান যাত্রার আয়োজন করে। ঐ বিজ্ঞান যাত্রায় ছিলো বি. প্রেমানন্দের কুসংস্কার বিরোধী বিভিন্ন ম্যাজিকের প্রদর্শন। বি. প্রেমানন্দের দেখানো খেলাগুলো থেকে আমরা "অলৌকিক নয় নিছক ম্যাজিক" অনুষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট হই। বুঝতে পারি সাধারণ মানুষের কাছে এ ধরনের অনুষ্ঠান খুবই গ্রহণযোগ্য হয়—এবং আমাদের বহু কথাও আমরা এর মাধ্যমে বলতে পারি, অনেকের সাথে যোগাযোগও দ্রুত গড়ে ওঠে।

ঐ বিজ্ঞানযাত্রায় আমরা অনেক বন্ধু পাই, যাদের সাথে আজও গভীর সম্পর্ক বর্তমান, ঐ বিজ্ঞানযাত্রার পর আমাদের উৎসাহও অনেক বেড়ে যায়। এরপর থেকেই বহু জায়গায় অনেক অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি। অনেক অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ পেয়েছি।

প্র : এখনো পর্যন্ত কতগুলো অনুষ্ঠান করেছো?

উ : তা অনেক, কম করে দু'শো তো হবেই।

প্র : "অলৌকিক নয় নিছক ম্যাজিক" ছাড়া এখন আর কি কি করছো?

উ : খোরপের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়ার পর **Forum for Education** -এর সাথে আমরা কিছুদিন টালিগঞ্জের একটি বস্তির স্কুলে পড়াতাম। কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন কারণে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। আপাতত মধ্য কলকাতায় একটা সান্ধ্য স্কুলে আমরা ক্লাস নিই।

প্র : আর কোন বৃহত্তর কাজের কথা মাথায় আছে নাকি?

উ : আমরা "গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কিছু কথা কিছু গান" নামে একটি সংকলনও প্রকাশ করেছি। দেখো, আমরা কিন্তু সহজ সরলভাবে ভাবতেই ভালবাসি, খুব বেশী বড় আদর্শ বা আন্দোলনের কথা মাথায় রেখে যে কাজ করি এরকম মনে করার কারণ নেই। বিজ্ঞান চেতনার অনুষ্ঠানগুলো যদি এতটুকুও প্রশ্ন করার, কারণ খুঁজবার মানসিকতা তৈরী করতে পারে সেটুকুই লাভ বলে মনে করি। আর এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহেই কিছুটা আশাবাদীও।

প্র : তোমাদের সংস্থাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রেজিস্ট্রেশন্ করিয়েছো কি?

উ : না, এখনো হয় নি। কারণ রেজিস্ট্রেশন্ পেতে গেলে নিয়মমত যে সাংগঠনিক কাঠামো দরকার আমাদের তা নেই। অর্থাৎ সেই সভাপতি-সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদগুলো আমরা ইচ্ছে করেই রাখিনি। আমাদের সদস্য মোটামুটি দু'ধরনের—সাম্মানিক ও সাধারণ সদস্য। ফলে ভবিষ্যতেও হয়তো কোন দিনই রেজিস্ট্রেশন করানো হবে না।

প্র : এতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে না?

উ : না। কাজ করতে কোন অসুবিধাই হয় না, ররং অনেক জটিলতা এড়ানো গেছে। আমরা প্রতি সপ্তাহে একদিন করে সকলে মিলে বসি। সেদিনই আমাদের ভবিষ্যতের কাজ, কাজের দায়িত্ব, হিসেব-নিকেশ প্রয়োজনমত ঠিক করে নেওয়া হয়। আর যেহেতু এখনো সরকারী বা বেসরকারী অনুদান ইত্যাদির চিন্তা করছি না তাই রেজিস্ট্রেশনের অন্যান্য সুবিধা আপাতত আমাদের কোন কাজে আসবে না।

প্র : একটা অনুষ্ঠান করতে গেলেতো কিছু খরচ আছে, সেসব জোগাড় হয় কিভাবে?

উ : সদস্যদের দেওয়া চাঁদা থেকে : সাধারণ সদস্যদের চাঁদা 2 টাকা এবং সাম্মানিকদের 5 টাকা। এ ছাড়াও যেখানে অনুষ্ঠান করি সেখান থেকেও মাঝেমধ্যে কিছু ডোনেশন পাওয়া যায়। তাছাড়া যাওয়া আসার ভাড়া তাঁরাই বহন করেন।

প্র : তোমাদের সাথে অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করার নিয়ম কানুন কি? ঠিকানা?

উ : সাধারণত প্রোগ্রামের মাস খানেক আগে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। আমাদের ছাপান কাগজে, অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু জিনিস পত্তরের লিস্ট আছে। সংগঠকদের এগুলো যোগাড় করে রাখতে হয়। তবে আমরা বেশী উৎসাহী বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট দল তৈরী করতে, যারা **workshop**-এর মাধ্যমে খেলাগুলো শিখে নেবে। এতে আমাদের উপর নির্ভরতা কমবে এবং আমাদেরও চাপ কমবে।

এছাড়া ভূপাল ও ওষুধের উপর আমাদের দুটি পোস্টার সেট আছে। যে কোন সংগঠন প্রয়োজনে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। আমাদের ক্লাবের নাম এখন 'বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়'। হাওড়া, ট্যাংরা প্রভৃতি অঞ্চলে গড়ে ওঠা "বিজ্ঞান চেতনা" গোষ্ঠীর সাথে একসাথে কাজ করার ইচ্ছে থেকেই ঐ "সমন্বয়" অংশটুকু যুক্ত হয়েছে।

আমাদের বর্তমান ঠিকানা :

বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয় (কলকাতা)
c/o বিপ্লব সিকদার, Room No. 78, 1 বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলকাতা 700 009

প্রতিবেদক □ শান্তনু ত্রিবেদী

বালি-বাণ

'বালি-বাণ'-এর প্রভাব ছাড়াতে ঝাড়ফুঁক এবং তেলাকুচি পাতার ভূমিকা আছে কি? কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও যুক্তিবাদী মন এর সঠিক উত্তর খুঁজে পায়।

গ্রামের দিকে আমরা যারা থাকি তারা অনেক ধরনের কুসংস্কারের সাথে পরিচিত। প্রায়শই 'বান' মেরে (মন্ত্রের জোরে) গাছ, গরু-ছাগল, জীবজন্তু এমন কি মানুষ-টানুষও মেরে ফেলা সম্ভব—এসব শোনা যায়। যদিও আমরা বন্ধুরা যখনই তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাই তারা বেশ খানিকক্ষণ হম্বিতম্বির পর কোন না কোন অজুহাতে পেছন দিকে হাঁটে।

যাহোক, সেদিনকার একটা ঘটনা—অল্পবয়স্ক একটা ছেলের বেশ কয়েকদিন যাবৎ হাতে-পায়ের মাংসে জ্বালা জ্বালা ভাব করছিল। কি করা যায়, তাদের বাড়ীর লোকজন সিদ্ধান্ত নেয় ঝাড়ফুঁক করাতে হবে, অতএব গুণিন ডাকো। গুণিন জোগাড় হল। পাশের গ্রামেই এনার বাড়ী। চৌকশ বলিয়ে-কইয়ে। এটাই তার পেশা। এই ভদ্রলোকের একটা অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনে আমি একদিন সন্দেহ প্রকাশ করায় বলেছিল—"দেখুন, আমি যদি ধোঁকা দিয়ে, ঠকিয়ে এ সমস্ত কাজ করি, তাহলে আমার ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যাবে।" সেদিনকার ত্রাতা—ডাক্তার-রূপে। গুণিন সাহেব মন্ত্রতন্ত্র আওড়ে, অবশ্যই সাথে হাত চেলে ঘোষণা করল, "ছেলেটাকে কেউ 'বালিবাণ' মেরেছে, তাই জ্বালাপোড়া করছে।" 'বালিবাণ' কথাটায় নতুনত্ব পেলাম। ঘটনা এগুতে থাকলো। বিশেষ পদ্ধতিতে ঐ বালির গুঁড়োগুলোকে মাংসের ভেতর থেকে বের করে দিতে হবে। ঐ সব বালিগুলো কেউ নাকি মন্ত্রের দ্বারা ঐ ছেলেটার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। গুণিনের বিশেষ পদ্ধতিটা এই রকম: প্রথমে বেশ কিছু তেলাকুচি গাছের পাতা জোগাড় করে আনলো। তারপর একটা চওড়া থালায় পরিষ্কার জল নিয়ে তার মধ্যে ছেলেটার একটা পা রেখে ঐ গুণিন ডাক্তার জাদুকরের কায়দায় বলল—দেখুন, থালার মধ্যে কোন বালিটালি আছে কিনা? সত্যিই ছিল না। এরপর ধোয়া তেলাকুচি পাতাগুলো দিয়ে থালায় রাখা পায়েতে ঘষতে থাকে। ফলে ভিজে পাতা থেকে সবুজ রস বের হয়ে পা দিয়ে গড়িয়ে থালার জলে জমে। মন্ত্র চলার সাথে সাথে অনেক পাতা এভাবে ঘষার পর গুণিন এক সময় থামে। আশেপাশের লোকজনের চোখেমুখে বিস্ময়ভাব। এরপর ছেলেটার পা থালা থেকে তুলে থালার সবুজ জল ওপর ওপর ফেলে দেয়। মিনিট কয়েক পর দেখা গেল থালায় সত্যি সত্যি অনেক বালির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা। অতএব এখন আর কোন সমস্যাই নেই, ছেলেটা জ্বালা থেকে মুক্তি পাবে। উপস্থিত যুক্তিহীন মানুষরা গর্বিত, প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পরিশেষে গুণিন মহাশয়ের 'দক্ষিণা' সহ বিদায়। এখানে একটু জানিয়ে রাখি বাস্তবে ছেলেটাকে মুক্তি পেতে অবশেষে যেতে হয়েছিল কিন্তু ডাক্তারের কাছেই, খেতে হয়েছিল ওষুধ এবং এখন সে সুস্থ।

যাই হোক, দু'একটা ছেলের জিজ্ঞাসু, যুক্তিবাদী মন কারণ খুঁজতে থাকে! শরীরে মন্ত্রের জোরে বালি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া ও তেলাকুচি পাতার সাহায্যে সেই বালি হাত-পা-এর মাংস থেকে টেনে বার করার ঘটনাকে মেনে নিতে পারে না। এই ছেলেরা কিন্তু আমাদের মত M. Sc., B. Sc. নয়। কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, উদ্ভিদবিদ্যার মোটামোটা বই-এর জ্ঞানও নেই। যেটুকু বিদ্যে আছে তার জোরে খুব জোর পরের তাঁতে সরু সরু সুত দিয়ে সারা দিনে দু' তিনটে লুঙ্গি, কাপড় বোনে, আর পরের মাঠে গতর খাটিয়ে ভাতের জোগাড় করে কোন রকমে। তারা ওখান থেকে গিয়ে ঠিক একই পদ্ধতিতে নিজের সুস্থ পায়ে তেলাকুচি পাতা ঘষে দেখে থালাতে একই রকম বালি জমছে। আবিষ্কারের আনন্দে, জালিয়াতের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবার সাহস পেয়ে যায় তারা এবং এ গ্রামে এরকম ধরনের উদ্ভট অলৌকিক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। যদিও সব ক্ষেত্রেই ঐ সব গুণিন বাবাদের সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর চালাকি উদ্ধার করে উঠতে পারে না বা অনেক ক্ষেত্রেই আবার বৈজ্ঞানিক কারণ, যুক্তি হাতের কাছে থাকে না। তাদের আবিষ্কার আমাকে উদ্বুদ্ধ করে আরও এগিয়ে যেতে। কি ভাবে ঐ বালি আসে তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা ওদের হাতে তুলে দেবার তাগিদ অনুভব করি, হয়ত কিছুটা দায়বদ্ধও হয়ে পড়ি একজন সামাজিক জীব হিসেবে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানের তথ্য বলছে: তেলাকুচি সহ অনেক রকম গাছই আছে যাদের পাতায় বালি কোষ (silicate cell) থাকে cuticle-এর নীচে মেসোফিল স্তরের আন্তঃকোষ ফাঁকে (intercellular space)। গাছের waste inert matter হিসেবে বালি এই কোষগুলোতে জমা হয়। এগুলো সাধারণ বালি যার দানা অতি ক্ষুদ্র। এর রাসায়নিক সংকেত SiO_2। ধানের পাতায় এ ব্যাপার খুবই সাধারণ, যার জন্যে ধানের পাতায় পা-হাত কেটেও যায় অনেক সময়। তেলাকুচি পাতা থেকে সবুজ রসের সাথে silicate cell বা বালি কোষের বালির অতিক্ষুদ্র কণাগুলো থালার জলের নীচে জমা হয়েছিল, তা-ই পাওয়া গেছিল।

ঘটনাটা খুবই ছোট্ট, কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনাটা থেকে যে সত্যটা উঠে এসেছিল—সেটা হল এই যে যুক্তিবাদী মন গঠন করার জন্যে কোন বড় বড় ডিগ্রীর প্রয়োজন হয় না এবং কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে সুবিধাভোগী ঘরের পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের বাইরে সুবিধা-বঞ্চিত মানুষদের বড় ভূমিকা আছে। এদের সামনে যদি আমরা স্থানীয় কুসংস্কার ও অলৌকিক ঘটনার বোধগম্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি তুলে দিতে পারি এবং সাথে সাথে এদের যদি কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনে আগ্রহী করতে পারি, তাহলে গণবিজ্ঞান আন্দোলন পায়ের নিচে শক্ত জমি পায়। □

অঞ্জন চতুর্বেদী

চিঠিপত্র

পরিপ্রেক্ষিতটি জানানো প্রয়োজন

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '৪৪ সংখ্যায় শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য্যের "মৌল গবেষণা : প্রয়োজন না প্রসাধন" পড়লাম। শ্রীভট্টাচার্য্যের আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু তাঁর একটি মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার বোধ করছি। তিনি লিখেছেন, "গত তিরিশ বছরে ফলিত ও প্রযুক্তি গবেষণায়ই বা কোন্ উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে…।"

এ ব্যাপারে সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতটি কোন পাঠকের জানা না থাকলে এ মন্তব্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে হয়েছে। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমেন পোদ্দার **Thought—A Socio-Technical Review** পত্রিকায় একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন বহু ক্ষেত্রে এমন কি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্রেও দেশীয় প্রযুক্তিকে অবহেলা করে কারিগরী সহায়তার ওপর একান্তভাবে নির্ভর করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি বলেন, ডানকুনিতে কোল ইণ্ডিয়া কমপ্লেক্সে ব্রিটিশ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু ধানবাদের একটি প্রতিষ্ঠান একই ধরনের প্রযুক্তি দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলো, এমন কি সেই প্রযুক্তি তারা বোকারোতে পাইলট প্ল্যান্টে ব্যবহারও করেছে। ন্যাশানাল জিওফিসিকাল রিসার্চ ইন-ষ্টিটিউটের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ভূগর্ভের খনিজ সম্পদের সন্ধানে চৌম্বক-সমীক্ষা করে এঁরা অয়েল এ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের (ONGC) কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজেক্টটি কানাডার একটি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা না থাকায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই অনীহার মূল কারণ নিরাপদ দেশীয় বাজার, যেখানে প্রতিযোগিতার অভাবে প্রায় যে কোনো পণ্যই ভালো দরে বিক্রি করা সম্ভব।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নানা প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে, বহুজাতিক কর্পোরেশনের কাছে প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি কেনার শর্তে। এর ফলে দেশীয় প্রযুক্তি অবহেলিত হতে থাকে। এভাবে ক্রমশ এই দেশ-গুলির গোটা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপরেই বহুজাতিক কর্পোরেশন তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে থাকে।

যে জাপানে মৌল-গবেষণায় সর্বাধিক গুরুত্ব, সেখানে বিদেশী প্রযুক্তিকে গবেষণার মাধ্যমে আত্মীকরণ ও দেশের পরিস্থিতি অনুসারে তার প্রয়োগ ঘটেছে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত প্রচেষ্টায়। □

23 মার্চ 1988 **কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া**

ক্রমশই বিভ্রান্ত লাগে

এখনও এক নিঃশ্বাসে 'বি-ও-বি' পড়ে ফেলি। দিশি-বিলিতি অনু-বাদগুলোর বাইরে, বাকী লেখা খুব সামান্যই। আশা মেটে না, ক্রমশই বিভ্রান্ত লাগে। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো, খানদানী বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে—অতিরঞ্জন, উচ্ছ্বাস আর তথ্যভ্রান্তিটা। আমাদের মতো লে-ম্যানরা, রীতিমতো বিজ্ঞানে উৎসর্গীকৃতদের কাছ থেকেই তথ্য জানবে—তাই না? তা-ও আজকাল ভেতরের প্রবন্ধে কী থাকছে—ভাবি না। কিন্তু সম্প্রতি জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1988 সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' পড়ে ভীষণ খট্‌কা লাগছে। বিষয়টা বিজ্ঞানের ইতিহাস—বেশ রিস্কি! বছর বিশ পঁচিশ পর পরই, ইতিহাসের দেয়াললিখনে হোয়াইট্‌-ওয়াশ্ করা হয়। 'বি-ও-বি' একটু সতর্ক থাকলে—আমরা ভালো জানবো।

(1) 'প্রিন্সিপিয়া'র তিনশত বর্ষের সম্পর্কে চুম্বক—'নিউটনের গতি-সূত্রই বলবিদ্যার অ-আ-ক-খ'। পরের লাইনটি থেকেও, ধারণা হতে পারে—'প্রিন্সিপিয়া' বোধহয় গতিসূত্রের উৎস। আসলে 'প্রিন্সিপিয়া' কিন্তু তা নয়। গতিসূত্র এর (প্রায় বিশ বছর?) আগেই আবিষ্কৃত। একটু বুঝিয়ে লিখবেন?

(2) 'কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের' আগেই কিন্তু বিজ্ঞানী হার্ট্‌জ নিউটনীয় বলবিদ্যা সংশোধন করে। হার্ট্‌জের সে দর্শন, দীর্ঘকাল বহু বিজ্ঞানী ও দার্শনিককে নাড়া দেয়। প্রসঙ্গত, 1888 সালে হার্ট্‌জের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের পরীক্ষামূলক আবিষ্কার না উল্লেখ করলে—পরবর্তী একশ' বছরের ইতিহাসে ঘাটতি হবে অমার্জনীয়। তাই না?

(3) আইনস্টাইন স্বয়ং কিন্তু মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষাটিকে উল্লেখ করে নি—প্রথম মূল রচনায়। পরেও কম গুরুত্ব দিয়েই উল্লেখ করে। কেন, কে জানে। 'পরীক্ষামূলক সমর্থনের' ভিত্তি-শতবর্ষ কথাটা কি ঠিক হলো?

(4) বিজ্ঞানীদের 'জন্মশতবার্ষিকী' ব্যাপারটা তো নীতিগতভাবেই ধিক্কার দিই। জন্মসূত্রে কেউ বিজ্ঞানী হয় না—যেমন আজকাল 'বিজ্ঞান মনস্কতা' শেখাচ্ছে আমাদের। তবুও এটা চলবে?

(5) 'নোবেলজয়ী' কথাটা কানে লাগে—সম্পাদকীয়তে। অন্যত্র গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখানেও হবে—তবে সময় লাগবে। কিন্তু ওতো শুধু কথার কথা নয়।

যতোই শেষের ক'টি লাইনে প্রগতিশীল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক—সি. ভি. রমনের সাথে বিজ্ঞানী কে. এস, কৃষ্ণানের নাম উল্লিখিত হয় না। নোবেলের শিকেটা দু'জনের কাজে একজনের কপালে ছিঁড়েছে যে! এই তো ইতিহাস!

(পরের পৃষ্ঠায়)

(6) শেষ প্রশ্ন, বড়ো দ্বিধায়। শ্রয়ডিংগার কি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পথিকৃৎ? না কি 1924-উত্তর 'নতুন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার?' পুরোনো ইতিহাস তো সেভাবেই লিখতো শুনেছি। কোয়ান্টাম তত্ত্বের বৈপ্লবিক উত্থান বোধহয় শ্রয়ডিংগারের অনেক আগে। 'ওয়েভ মেকানিক্স্' স্তরে শ্রয়ডিংগার পথিকৃৎ—বোধহয়।

ওপরের সবটুকু নিজের বিভ্রান্ত অবস্থাজনিত। ভুলভাল ধরার জন্য নয়। সম্পাদকীয়—'বি-ও-বি' র ভাবমূর্তি গড়ে। ভবিষ্যতেও গড়বে। মনে খট্‌কা লাগলো—লিখলাম।

2 এপ্রিল 1988 **সৌমেন গুহ, কলকাতা**

স্খলিত হয়েছে চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু

1988-র মার্চ-এপ্রিলে প্রকাশিত 'বি-ও-বি'র একাদশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় 'বি-ও-বি'র কথা শিরোনামে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ জানানো এবং/বা তার সমালোচনা করাই আমার লক্ষ্য এবং যে প্রেক্ষাপটে এর উদ্ভব তা জানি ব'লেই সাহসের পর্দাটা একটু উঁচু মাত্রায় পৌছতে পারে, মাপ করবেন।

প্রস্তাবনা হিসেবে খারাপ না—হ্যাঁ, "আসুন না, নিজেদের দিকে তাকিয়েও হাসতে শিখি"! কিন্তু তা কোন্ সময়ে, কখন উপযুক্ত? যখন হাল্কা হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে মানুষ, বিবেচনাহীনভাবে গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে তরুণ সমাজ, যখন প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা অফিস পরিণত হচ্ছে সান্ধ্য আড্ডার আসরে, তখন দর্পণে নিজের মুখ দেখার নাম ক'রে আরো ধ্বস্ত, ব্রণ-বিধ্বস্ত করবো সময়ের মুখ?

মানছি, অতি গুরুগম্ভীরভাব ও অতিলঘুভাবপ্রবণতা এ দুই বিপরীতের মাঝামাঝি একটি সঠিক অবস্থান নিশ্চয়ই আছে—যা সব সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না বা করা শক্ত। আর তাতেই তো যত মুস্কিল—একের কাছে যা নিরেট রসিকতা অন্যের কাছে তা-ই তিক্ততার উপাদান! এর জন্য ব্যক্তিবিশেষের রুচি-অরুচি, ক্ষমতা-অক্ষমতা, পছন্দ-অপছন্দের প্রকৃতি তথা রসিকতাবোধের তারতম্য ইত্যাদির যেমন ভূমিকা আছে ঠিক ততটাই ভূমিকা আছে যিনি বা যাঁরা রসিকতা করবার চেষ্টা করছেন তাঁদের ব্যক্তি-বা-গোষ্ঠী-গত দক্ষতা-পারদর্শিতার প্রশ্নটিও। এক্ষেত্রে সামান্যতম শক্তির অভাব ঘটলেও রসিকতা পরিণত হয়ে যায় ক্লাউনিশ ভাঁড়ামোতে—যেটা আমরা কেউ-ই চাইনা। তাই সতর্কতা প্রয়োজন। নির্দোষ কৌতুকপ্রবণতা, পরিহাসপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে মহৎ গুণ; কিন্তু যে কৌতুক কৌতূহল উদ্রেক করে না, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাসাতে পারে না তা পাঠকের পক্ষে কৌতুক না যন্ত্রণা? আরেকবার ভাববেন আপনারা।

একথা অনস্বীকার্য যে অতি গুরুগম্ভীর ভাব প্রগতিশীল কাজকর্মের পক্ষে মস্ত অন্তরায় এবং এটি কোনো নতুন রায় নয়; প্রকৃত প্রগতিশীল কর্মীমাত্রই তা জানেন। কারণ, অতিগাম্ভীর্য সাধারণের সঙ্গে অনেক সময়ই দৃশ্য-অদৃশ্য দূরত্ব সৃষ্টি করে; ফলে আসল কাজটিই ব্যাহত হয়। কিন্তু তার প্রতিষেধক কিন্তু হাল্কা হওয়া নয়; প্রতিষেধক হ'ল যথাসম্ভব সহজ হওয়া।

আর, এই 'সহজ' হওয়ার কাজটিই খুব জটিল—বিশেষত আমাদের মত কুটিল বুদ্ধিজীবী (বুদ্ধি-জিভ-ই!)—গোছের মানুষজনদের পক্ষে!

একটি বিষয়কে সম্পাদকীয় স্তম্ভে উৎক্ষেপণের আগে ভাবা দরকার তখনকার সময় ও সমাজের মূল ধারাটি কোন্ দিকে; তখন ঘটনার প্রধান দিক কোন্‌টি। আজ প্রগতিশীল কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে প্রায়-বন্ধ্যাত্য নেমে আসছে, সংগঠনগুলোর অবস্থা সন্ধ্যাকালীন সূর্যের মত, তার জন্য দায়ী কি প্রগতিশীল মানুষজনদের অতি-আদর্শবাদিতার রাশভারি ভাব না আদর্শগত ক্ষেত্রে অতি ঢিলেঢালা ভাব এবং আড্ডা-বাজির মনোভাব-সঞ্জাত চরম শৈথিল্য ও উদ্দেশ্যহীনতা? আপনারা কী বলেন? যে পটভূমিকায় 'বি-ও-বি'র কথায় 'হাসতে শিখি'র ডাক দেওয়া হয়েছে তা, আমার মতে, 'কাতুকুতু দিতে শিখি'র নামান্তর মাত্র!

সুতরাং বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেদিনেও আপনাদের ভাবনার ভারসাম্য বিচলিত হয়েছিল, স্খলিত হয়েছিল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুটি এবং দুর্ভাগ্যজনক-ভাবে তা আজও সেই একই অবাঞ্ছিত অবস্থানে রয়ে গিয়েছে। আসুন, আমরা সবাই খোলামনে আমাদের ভুলচুক, ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-পতন সমালোচনা ও যথাসম্ভব সংশোধন করি। দোহাই, সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাফাই গাইবেন না—কারণ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও তার প্রয়োগক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সঠিকতার চূড়ান্ত নির্ণায়ক তো নয়ই—খুব নির্ভরযোগ্য সূচকও যে নয় তার, এ কথাটি মানবেন আশা করি।

19 মে 1988 **সুব্রত ভট্টাচার্য, কলকাতা**

ব্যক্তিত্বের সঙ্কট। বিজ্ঞানমনস্কতার ইতিহাস॥

চিঠিপত্র অথবা প্রবন্ধ, মুস্কিল হয়েছে এর মাঝামাঝি একটা কিছু থাকলে, আমার এ মতামতটা সেই জাতের।

প্রসঙ্গ: "বি-ও-বি" মার্চ-এপ্রিল 1988 সংখ্যায় দু'টি লেখা "পরিবেশ আন্দোলন এবং সঙ্কটগ্রস্ত এক ব্যক্তি" (র. চ.) আর "লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার" (রবীন মজুমদার)।

পরিবেশ আন্দোলন এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্কট

র. চ. তার লেখায় এমন একটা বিষয়কে সঙ্কট বলছে, যেটা আইনের

ভাষায় বলা যায়—তুমি নিজের ভুলকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করতে পারো না।

সাদামাটাভাবে পরিবেশ আন্দোলন তিন ধরনের ব্যক্তিরা করে।

(1) নিছক হুজুগ বা ফ্যাশন বা করতে হয় বলে এক দল (সম্ভবত শতকরা নব্বই জন এরা) ;

(2) নিজের ধান্দায় বা কায়েমী স্বার্থে একদল (সম্ভবত শতকরা পাঁচ ভাগ এরা) ;

(3) গভীরভাবে ভেবে চিন্তে লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে একদল (এরাও সম্ভবত শতকরা পাঁচ ভাগ)।

এই শেষ দু'দল প্রাণপণে চেষ্টা করে প্রথম দলটিকে চালনা করতে, বোঝাতে, দলে আনতে—আসলে, সেটাই হলো ভালোর সাথে মন্দের প্রতিযোগিতা। কিন্তু সব থেকে বিপজ্জনক প্রথম দলটিই। এলো-মেলো কাজ, কথা, লেখা ইত্যাদির শুধু নয়, যাবতীয় হতাশা, উত্তেজনা, অতিশয়োক্তি আর শক্তির উৎস এরাই। এ ধরনের বিশাল বাহিনী অন্য আন্দোলনে থাকলেও—পরিবেশ আন্দোলন শ্রেণীগতভাবে ঠিক পেটের দায় থেকে জন্ম নেয় না। ফলে এই দলটি হয়ে ওঠে প্রায়শই দায়িত্বজ্ঞানহীন। সবচেয়ে বড়ো সংগ্রাম হলো—প্রথম এই দলটিকে দ্বিতীয় দলের কবলমুক্ত করে তৃতীয় দলে পরিণত করা। র. চ. 'র লেখা প্রসঙ্গে তৃতীয় দলের সম্ভবত মতামত থাকবে (যে দলে আমি নিজেও পড়ি না)—

(1) মেকল কেমিক্যাল জাতীয় কারখানার দূষণের বিরোধী আন্দোলনের স্ট্র্যাটেজী হতেই হবে—কারখানার শ্রমিকদেরকে ক্ষতিপূরণ বা খোরপোষ দিতে মালিককে বাধ্য করা (উল্লেখ্য : সিল্কউড মামলা আমেরিকায়)। কারখানার শ্রমিকদেরকে শক্তি হিসেবে না পেলে পরিবেশ আন্দোলন শ্রেণীভিত্তি হারাবে। কারণ, তারাই সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত।

(2) মেকল কেমিক্যালের হাইকোর্ট পিটিশন একটু পাকা চোখে দেখলেই বোঝা যায়—এ মামলায় পরাজয় অনিবার্য। দুর্বল পিটিশন। পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকলে—এটা হতো না।

(3) শেষত, আমরা নিজেরা কারখানার শ্রমিকদের কিছু বোঝানোর আগে 'ভেতর থেকে' (from within) নিজের নিজেদের পেশায় লড়তে পারলে, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করতে পারবো। আমরা যারা যথেচ্ছ অন্যায় চুপ করে মেনে নিই টু-পাইস কামাবার ধান্দায়—তারাই যখন মোজেস্ সেজে পরিবেশ আন্দোলন করি, শ্রমিকদের সমাজে এর থেকে বড়ো দূষণ আর কোন্‌টে।

এ তিনটি আমাদেরই ব্যক্তিত্বের সঙ্কট। বাইরে থেকে আসেনি।

লোকবিদ্বান ক্যালেণ্ডার

"বি-ও-বি"-র প্রচ্ছদে লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডারটিতে ইংরেজীতে লেখা Lokvidnyan Calendar—যার কোনো অর্থ হয় না, 'লোকবিদ্বান' ছাড়া। আশা রাখি, বিভ্রান্তি প্রতি পাতায়। এখানে বিবেচ্য রবীন মজুমদারের পর্যালোচনার একটি লাইন, ক্ষুদে অক্ষরে—1977 সালে ত্রিবান্দ্রমে 'কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' আয়োজিত সম্মেলন থেকে জনগণের জন্য বিজ্ঞান কথাটি ব্যাপ্তি লাভ করেছিলো কি না।

যতোই শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হোক—বিজ্ঞানমনস্কতা (যেটা ঘুরে ফিরে আজও বিচিত্র গণবিজ্ঞানের আন্দোলনের ভিত্তিসূত্র) শুরু হয় ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায় সংবিধানের 42-তম সংশোধনের সময় থেকে। সংবিধানের 51A ধারায় সপ্তম ও অষ্টম উপধারায় প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা যুক্ত হয় 1976 সালে। সে সময় মনে আছে (দরকার হলে বি-ও-বি ছাপতেও পারে)—বিভিন্ন সংবাদপত্র বিসেস করে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ইত্যাদির ওপরে এমন কি সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখতো। দ্রুত, একটা বিশেষ কারণে 'জনগণের জন্যে বিজ্ঞান' ইত্যাদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মদত দিতে থাকে। এবং সর্বভারতীয় বিজ্ঞান 'জাঠায়' তা এখনো প্রকট (টাকাটা দিয়েছে NCERT)।

বিশদ ইতিহাসে না গিয়ে, আর একটা কথা বলি। 'কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারি অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময়, Economic and Political Weekly-র একটা প্রবন্ধ Science for Social Revolution থেকে। পরমেশ্বরনের লেখা Nature, Science and Society বইটি নিয়ে তখনই ওরা প্রচার অভিযানে নেমেছে (EPW-টা আমার হাতের কাছে নেই)। কাজেই 'গণবিজ্ঞান'-এর ধারণার বয়স বছর খানেক বেশী সম্ভবত। আর ব্যাপ্তিটা সম্বন্ধে বলতে পারছি না।

31 মে 1988

সৌমেন গুহ, কলকাতা

□ □ □

'জলের খোঁজে'

গত 16 এপ্রিল '88 তারিখে ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে আর. এন. মুখার্জী হলে "জল সম্পদের সংরক্ষণ" শীর্ষক এক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডাইরেক্টরেটের ডিরেক্টর পি. কে. ব্যানার্জী বলেন, ইসরায়েলে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত মাত্র তিন থেকে চার ইঞ্চি হওয়া সত্ত্বেও জল সম্পদের সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের কাজ চলছে ; অথচ গড় বার্ষিক পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও পুরুলিয়া চিরকালই খরাপীড়িত অঞ্চল হয়ে থাকবে কেন? শুখা মরশুমের জন্য জল ধরে রাখার উপযোগী প্রযুক্তি কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উল্লেখ করেন। এ রাজ্যে জলসম্পদ সমীক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রশাসনিক ব্যক্তিরা অবহিত না থাকায় এ ধরনের প্রস্তাবকে তারা উপেক্ষা করে চলেছেন। তিনি বলেন, ভূমিক্ষয় ও বনাঞ্চল-হ্রাস রোধ করা খুবই জরুরী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিকাল ইঞ্জিঃ বিভাগের অধ্যাপক বলরাম বসু বলেন পলি পড়ে গঙ্গার গভীরতা প্রচুর কমার ফলে বাড়তি বৃষ্টি ঘটলেই কলকাতা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে নিকট ভবিষ্যতে। অগ্নিনির্বাপনের জন্য জলের 'আপৎকালীন সঞ্চয়ের' ব্যবস্থা নগর-পরিকল্পনার মধ্যেই থাকা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন ডঃ বি. কে. ভট্টাচার্য প্রমুখ।

প্রতিবেদক : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বি-ও-বি'র ভুল সংশোধন

এক ॥ মার্চ-এপ্রিল 1988 সংখ্যার তৃতীয় প্রচ্ছদে মুদ্রিত প্রতিবেদনটির (বিজ্ঞান দিবস '88) প্রথম কলাম নিচ থেকে গুণে 6-7 লাইনে একটি ভুল ছিল—

ছাপা হয়েছিল : ...ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী পরিষদ...

ওখানে পড়তে হবে : ...ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি...

দুই ॥ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1988 সংখ্যার 21-23 পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সূচীটির পৃষ্ঠা 21, দ্বিতীয় কলম, তৃতীয় লাইনে—

ছিল : বিনয় সরকার

হবে : বিজয় সরকার

তিন ॥ ঐ সংখ্যারই 6-9 পৃষ্ঠার নিবন্ধে পৃঃ 9, প্রথম কলম, 19 লাইনে—

ছিল : ...হোমোস্টাসিস (Homostasis) ...

হবে : ...হোমিওস্ট্যাসিস (Homeostasis) ...

R. N. 34929/79
YEAR 11 NUMBER 6

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o A. Lahiri
EC 106, Salt Lake, Cal-64
May-Jun 1988

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

গত এক বছরে কি কি ছিল

মে–আগস্ট 1987

☐ ☐ শ্রমিক উদ্যোগে শহীদ হাসপাতাল ॥ শান্তনু ত্রিবেদী ☐ পরমাণু সাম্রাজ্যের অন্দর মহল ॥ বিশেষ প্রতিবেদক ☐ অর্দ্ধেক আকাশের নক্ষত্রেরা ॥ স্বরূপ গুপ্ত ☐

☐ ☐ **ক্রোড়পত্র : বি-ও-বি'র দশ বছর** ☐ আগামী দশ বছরের জন্য প্রস্তুতির পক্ষে ॥ দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী ☐ বি-ও-বি'র এক দশক : "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ" ॥ সুব্রত ভট্টাচার্য ☐ বি-ও-বি'র বন্ধুদের প্রতি ॥ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' ॥ দিলীপ হোতা ☐ দশ বছরের সূচী : 'নিউক্লিয়ার বিতর্ক' ॥ সংকলন ☐ ☐

☐ জপুরে রাসায়নিক দূষণ ॥ বরেন ভট্টাচার্য ॥ বি-ও-বি'র পক্ষে তাপস ঘোষ ☐ ☐

সেপ্টেম্বর–ডিসেম্বর 1987

☐ ☐ সমর সেন : প্রয়াণ, স্মরণ ও শ্রদ্ধা ॥ স: ম:, বি-ও-বি ☐ 'আদিবাসী চিকিৎসা : একটি বিকল্প ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে ॥ আশিস কুণ্ডু ☐ কমপিউটার : কিছু কথা কিছু প্রশ্ন ॥ সুরঞ্জন কর ☐ পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প : প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ☐

☐ ☐ **ক্রোড়পত্র : বি-ও-বি'র দশ বছর** ☐ জীবনী আলোচনায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী ॥ রবীন মজুমদার ☐ মনুষ্যকৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ॥ কুমারেশ মিত্র ☐ বি-ও-বি'তে 'মন' ॥ অমল সোম ☐ পরিবেশ দূষণ আলোচনায় বি-ও-বি ॥ পার্থ সেন ☐ ☐

☐ আরো বিকলাঙ্গ শিশু অথবা আর হাই ডোজ ই·পি নয় ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ মন্দির বাজার : সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ॥ দীপক ☐ জপুরে ক্রোমিয়াম দূষণ : সর্ষের মধ্যে ভূত ॥ সুরশ্রী চৌধুরী ☐ ☐

জানুয়ারী–ফেব্রুয়ারী 1988

☐ ☐ সবুজ সম্ভাবনা ॥ সুমিত বিশ্বাস, সুজয় মুখার্জী, সুরঞ্জন কর ☐ জ্ঞান : অজ্ঞান, বিজ্ঞান ॥ স্বরূপ গুপ্ত ☐ গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও মহিলাদের সংগ্রাম ॥ (মূল রচনা) পদ্মা প্রকাশ ☐ মৌল গবেষণা : প্রয়োজন না প্রসাধন ॥ সুব্রত ভট্টাচার্য ☐ সাবধান ! ওপরওয়ালা নজর রাখছে ॥ (সংগ্রহ) সুরশ্রী চৌধুরী ☐ মাটি খাওয়া রোগ ॥ স্মরজিৎ জানা ☐ 'অখাদ্য খাওয়া রোগ'—পশুতে ॥ সুকুমার সাহা ☐

☐ ☐ **ক্রোড়পত্র : বি-ও-বি'র দশ বছর** ☐ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ ☐

☐ নিকারাগুয়ার ডায়েরী ॥ অনিল গুপ্তা ☐ ☐

মার্চ-এপ্রিল 1988

☐ ☐ সবুজ সম্ভাবনা (দুই) ॥ সুমিত বিশ্বস, সুজয় মুখার্জী, সুরঞ্জন কর ☐ পদ্ধতির সন্ধানে বিজ্ঞান ॥ স্বরূপ গুপ্ত ☐ ভারতীয় প্রযুক্তি পরিস্থিতি : যুক্তি, তর্ক ও আশা নিরাশা ॥ সুব্রত ভট্টাচার্য ☐ আর্সেনিকে আক্রান্ত অশোকনগর : একটি সমীক্ষা ॥ রাজশেখর রায়চৌধুরী ও অপূর্ব সাহা ☐ সার কারখানার বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলন : বর্তমান পরিস্থিতি ॥ নিজস্ব সংবাদদাতা ☐ পরিবেশ আন্দোলন এবং সঙ্কটগ্রস্ত এক ব্যক্তি ॥ র. চ. ☐ তারাপুর : কিছু বাস্তব সমস্যা ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ না, পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু চুল্লী চাই না ॥ মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠি, স: ম: বি-ও-বি ☐ অ্যামনিওসেন্টেসিস : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ॥ দীপক ☐ গণবিজ্ঞান : লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার ॥ রবীন মজুমদার ☐ বিজ্ঞান দিবস '88 ॥ শান্তনু ত্রিবেদী ☐ ☐

এ ছাড়া বই-পরিচিতি, সমাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গে মন্তব্য।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং সেন্টার, 18B ভুবন ধর লেন, কলি-12 থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত